বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন উপলক্ষে প্রকাশিত

Published on the occasion of World Environment Day 5 June 2022

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২

উপদেষ্টা
ড. আবদুল হামিদ

প্রধান সম্পাদক
মোঃ হুমায়ুন কবীর

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার
মির্জা শওকত আলী
মোঃ জিয়াউল হক
মোঃ মাসুদ হাসান পাটোয়ারী
মোঃ রেজাউল করিম
একেএম রফিকুল ইসলাম
সৈয়দ আহম্মদ কবীর
ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব
খন্দকার মাহমুদ পাশা
মোঃ মাহবুবুর রহমান খান

মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

Published by the Director General, Department of Environment

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: +৮৮-০২৮১৮১৮০০, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮১৭৭২
ইমেইল: dg@doe.gov.bd, ওয়েবসাইট: www.doe.gov.bd, ফেসবুক: facebook.com/doebd

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

বাণী

পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পরিববেশ দিবস ২০২২' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

প্রকৃতি এবং পরিবেশের নানা উপাদান গ্রহণ করেই আমরা বেঁচে থাকি। কাজেই প্রকৃতি ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে পৃথিবী তথা আমাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে আমাদেরকে প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। প্রকৃতির অক্ষুণ্নতা বজায় রাখাকে গুরুত্ব দিয়ে এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ও স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে Only One Earth: Living Sustainably in Harmony with Nature যার ভাবার্থ, 'একটাই পৃথিবী: প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন'। অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। স্লোগানটি প্রকৃতি ও পরিববেশকে সংরক্ষিত রাখার পাশাপাশি ধরিত্রীকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বার্তা বহন করে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনন্য নিদর্শন আমাদের এই বাংলাদেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, পাহাড়-অরণ্য, নদ-নদী, বিপুল উপকূলীয় প্যারাবন এবং বঙ্গোপসাগর মিলে আমরা পেয়েছি প্রকৃতির এক অনন্য লীলাভূমি। এদেশের মানুষ অনাদিকাল থেকে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান আহরণের মাধ্যমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে এবং প্রথাগতভাবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করছে। সরকার জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশগুলোকে সংরক্ষিত এলাকা ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণাপূর্বক সেগুলোর প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। যেকোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সময় প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য যাতে বিনষ্ট না হয়, সে দিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া আবশ্যক। কারণ, প্রকৃতি বাঁচলে আমরা বাঁচব। প্রকৃতি এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে; অপরদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হবে। এ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে ধরিত্রীকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমি সকলকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাই। আসুন, সুখী-সুন্দর সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আমরা সবাই একযোগে কাজ করি এবং বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করি।

'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২' উদযাপন সফল হোক - এ কামনা করি।
জয় বাংলা
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের শ্লোগান- 'Only One Earth: Living Sustainably in Harmony with Nature' অর্থাৎ 'একটাই পৃথিবী: প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন' প্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পরিবেশই প্রাণের ধারক ও বাহক। পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন এবং সম্পদের অতি ব্যবহারের ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশ আজ অনেকটাই বিপর্যস্ত; হ্রাস পাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। মানবসৃষ্ট কারণে পরিবেশ দূষণ মোকাবিলায় দূষণকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইন প্রয়োগ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারণার মাধ্যমে আমরা জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজ করে যাচ্ছি।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানবসভ্যতার অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। আওয়ামী লীগ সরকার ইতোমধ্যে জাতিসংঘের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার অংশ হিসেবে Updated Nationally Determined Contribution (NDC) এবং জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan) গ্রহণ করেছে। এছাড়াও, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য 'Mujib Climate Prosperity Plan' প্রস্তুত করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিপথকে জলবায়ু বিপদাপন্নতা থেকে জলবায়ু সহিষ্ণুতা এবং তা থেকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রভাব কাটিয়ে উঠে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উনয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে আমাদের সরকার প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণরোধ, সমুদ্র সম্পদ আহরণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনমি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি আশা করি, বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে। সরকারের পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণে বিশ্ব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

বাণী

পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৫ জুন, ২০২২ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির এবছরের প্রতিপাদ্য- 'Only One Earth: Living Sustainably in Harmony with Nature' যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে, একটাই পৃথিবী: প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তিনটি বিষয় জোরদার করতে হবে তা হলো: পরিবেশের সুরক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি। একবিংশ শতাব্দীর টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিবেশবান্ধব অর্থনীতিই হচ্ছে চালিকাশক্তি, যার মাধ্যমে সর্বনিম্ন কার্বন নিঃসরণ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি নিশ্চিত করতে হলে দূষণমুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতির শিকার দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম কাতারে। আমাদের জীবন-জীবিকা এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ আজ চরম হুমকির সম্মুখীন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সুশাসন, টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে কৃষি, পরিবহন, জ্বালানি, শিল্প, বন, পানিসম্পদ ও অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন করার সাথে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিলেন এবং তিনি সে সময়ই চিন্তা করেছিলেন যে, সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এলক্ষ্যে তিনি প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের পরিবেশ দূষণরোধ ও সংরক্ষণ এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন কাজ করে যাচ্ছে। শিল্প দূষণ হ্রাসের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে শাস্তি ও জরিমানা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে পুরো জাতিকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনসহ সামগ্রিক পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব হ্রাসকল্পে নিবেদিত সকল প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ এর প্রতি রয়েছে আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন। আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২২ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি.)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

উপমন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

বাণী

জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসুচি (UNEP) এর উদ্যোগে প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে দিবসটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এবছর এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক উদ্যোগের ৫০ বছর পূর্তি হচ্ছে। এবং দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- 'Only One Earth: Living Sustainably in Harmony with Nature' (যার ভাবানুবাদ হলো একটাই পৃথিবী: প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন। এর মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণায়নজনিত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক ক্ষতি প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতা এবং প্লাস্টিক বর্জ্যসহ অন্যান্য বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থের দূষণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও বাংলাদেশে যথাযথ গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালিত হচ্ছে।

উচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ এদেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ এবং ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশ, প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ বাড়ছে। যা প্রশমনে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে মিল রেখে জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত আইন ও বিধিসমূহ, নীতিমালা, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও কঠিন বর্জ্য এবং ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা প্রণয়ন, Updated Nationally Determined Contributions (NDC) জাতিসংঘ জলবায়ু সচিবালয়ে দাখিল, এছাড়া বন আইন সংশোধন, National Adaptation Plan (NAP) এবং Mujib climate Prosperity Plan ইত্যাদি চূড়ান্তকরণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আমি আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে এ উদ্যোগ ও কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে আমরা সফল হব।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২২ এর জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

হাবিবুন নাহার, এমপি

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সভাপতি
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

বাণী

পৃথিবী নামক গ্রহ, তার সুন্দর প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে বিশ্বব্যাপী জনসচেনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে সকলকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সারা বিশ্বের সাথে একযোগে বাংলাদেশেও আজ আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২' উদযাপন করছি। ১৯৭২ সনে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ বিষয়ে জাতিসংঘ সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনের স্মরণে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। এ বছর স্টকহোম সম্মেলনের ৫০ বৎসরপূর্তি হলো।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির এ বছর পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য,'Only One Earth: Living Sustainably in Harmony with Nature' যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে একটাই পৃথিবী: প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন'। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভারের ফলে সৃষ্ট এই সংকটময় সময়ে এ প্রতিপাদ্য খুবই প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমার অভিমত। এ প্রতিপাদ্য আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন অংশ এবং প্রকৃতির উপর আমরা ঘনিষ্টভাবে নির্ভরশীল। প্রকৃতির সাথে আমাদের সম্পর্ককে আরও নিবিড় করা, এর অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং প্রকৃতিকে সুরক্ষা করার বিষয়টি আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করতে হবে তা এ বছরের প্রতিপাদ্যে ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশের বিশাল গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য সর্বোতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভশীল। ফলে, যে কোন কারণে দেশের প্রতিবেশ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হলে গ্রামীণ জনগণ সর্বপ্রথম এ ক্ষতির শিকার হন। ক্ষুদ্র আয়তনের এ দেশে মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের অবৈজ্ঞানিক, অপরিকল্পিত ও অতিরিক্ত আহরণ, দ্রুত নগরায়ন, শিল্পকারখানাসৃষ্ট দূষণ ইত্যাদি কারণে যুগপৎভাবে পরিবেশ অবক্ষয় ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিলীন হচ্ছে। এগুলোর সুস্পষ্ট প্রতিফলন হলো: বনভূমি উজাড়, নদীদূষণ, মৎস্যসম্পদ উজাড়, জলাভূমি ধ্বংস, জমির উর্বরতার অবক্ষয় ইত্যাদি। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সরকার টেকসই উন্নয়নের নীতি অবলম্বন করে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, যেমন: বনসম্পদ ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য নতুন নতুন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন বা সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা, পরিবেশসংক্রান্ত বিধিবিধান প্রণয়ন, সংশোধন এবং পরিবেশগত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোড়দার। এ সবের পাশাপাশি দেশে বিভিন্ন জায়গায় বোটানিক্যাল গার্ডেন, এভিয়ারি ও ইকোপার্ক গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সাথে সাথে কর্মব্যস্ত মানুষ প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে এর নির্মল সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করছে।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

বাণী

পরিবেশ ও প্রতিবেশগত অবক্ষয়ের হাত হতে ধরিত্রীকে বাঁচানোর লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ৫ জুন ২০২২ এর তাৎপর্য তুলে ধরে দেশের আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) কর্তৃক নির্ধারিত এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'Only One Earth: Living Sustainably in Harmony with Nature' যার ভাবার্থ 'একটাই পৃথিবী: প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন'-যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। সকল প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অস্তিত্ব প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির মাঝে গড়ে ওঠা প্রতিবেশ ব্যবস্থা বিভিন্ন সেবা (Ecosystem Services) দিয়ে সকলকে বাঁচিয়ে রাখে। অধিক জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন, আধুনিক ও বিলাসী জীবনযাত্রার ফলে আমরা প্রকৃতির ভারসাম্য ক্রমশ নষ্ট করে ফেলছি। মানুষের এ অপরিণামদর্শী কার্যকলাপের ফলে ব্যাপক হারে বায়ু ও পানিদূষণ, ভূমিক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বাস্তুতন্ত্র মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন এবং ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আইপিসিসি'র জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূমি সংক্রান্ত রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী প্রায় ১০ লক্ষ প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি প্রাকৃতিক বাসস্থান হারানোর কারণে বিলুপ্তির পথে। একমাত্র প্রকৃতির সাথে সম্প্রীতি রেখে অবক্ষয়িত প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ এবং সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

বর্তমান সরকার দেশের প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ মৌলিক নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উনয়নে বিভিন্ন আইন, বিধিমালা ও নীতি জারিপূর্বক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং অবক্ষয় রোধে দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণাপূর্বক এসব এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভূমির অবক্ষয়রোধ ও খরা মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৫-২০২৪) গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রতিবেশ-ভিত্তিক অভিযোজন (Ecosystem-Based Adaptation, EbA)-এর জন্য হাওর ও বরেন্দ্র এলাকার উপযোগী নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্লু-ইকোনোমি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের অনুধাবন করতে হবে প্রকৃতিতেই রয়েছে আমাদের সুরক্ষা। প্রতিবেশ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, প্রকৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণ, জনসচেতনতা অপরিহার্য। আসুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রকৃতির সাথে নিবিড় বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে একমাত্র পৃথিবীর টেকসই উন্নয়নে আমরা সচেষ্ট হই।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২২-এর গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

ড. ফারহিনা আহমেদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

শুভেচ্ছা

পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশেও প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UN Environment Programme) কর্তৃক নির্ধারিত এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য- "Living sustainably in harmony with nature" এবং স্লোগান নির্ধারিত হয়েছে "Only One Earth" যার বাংলা ভাবানুবাদ "একটাই পৃথিবী: প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন"। এ বছর নির্ধারিত প্রতিপাদ্য ও স্লোগান এর মর্মার্থ হলো-জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরিচ্ছন্ন-সবুজ জীবনধারাকে অনুসরণ করার মাধ্যমে নৈসর্গিক প্রকৃতির সহচর্যে টেকসই জীবন যাপন করা।

পৃথিবী নামক এই গ্রহটি আমাদের একমাত্র আবাসস্থল, যার সীমাবদ্ধ সম্পদ রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে মানবসভ্যতার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। জাতিসংঘের তথ্য মতে, আগামী দশ বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০ লক্ষ প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৭০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রতি তিনটির মধ্যে একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে। পৃথিবীর ৭৫ শতাংশ ভূভাগ এবং বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ সামুদ্রিক এলাকা আজ পরিবেশগত হুমকির সম্মুখীন। আমরা যদি এই পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ করতে না পারি তাহলে ব্যাপকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ তথা পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী ধ্বংসের কারণে মানুষের খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমগ্র বাস্তুতন্ত্রে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ কারণে প্রকৃতির সাথে টেকসইভাবে বাঁচার প্রয়োজনীয়তার তাগাদা থেকেই টেকসই উন্নয়ন প্রত্যয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণার্থে প্রতিবেশ ব্যবস্থা, বন ও বন্যপ্রাণী, জলাভূমি ও সর্বোপরি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর প্রাকৃতিক সম্পদ তথা পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া রোধ, বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এর পাশাপাশি প্রতিবেশ সুরক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা ও এটি সুষ্ঠু পরিচালনাসহ সারা দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নানাবিধ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক কনভেশন, চুক্তি, প্রটোকল অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রকৃতিতেই রয়েছে আমাদের সুরক্ষা। তাই, প্রকৃতিকে বাঁচানোর এখনই সময়। পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সকল বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী এবং সর্বপোরী সকল মানুষের মধ্যে উন্নয়নে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমবেত প্রচেষ্টাই পারে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে।

সর্বশেষে, আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২-এর সার্বিক সাফল্য প্রত্যাশা করছি।

ড. আবদুল হামিদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০৫ জুন ২০২২

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়ে গণসচেতনতা ও যথার্থ দায়িত্বশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এ বছরও ৫ই জুন বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন হচ্ছে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UN Environment Programme) এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Living Sustainably in Harmony with Nature'। প্রতিপাদ্যের বাংলা করা হয়েছে 'প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন'। এ বছরের স্লোগান 'Only One Earth'। স্লোগানের বাংলা 'একটাই পৃথিবী'।

পৃথিবীজুড়ে প্রকৃতির সাথে অসামানঞ্জস্য কর্মকান্ড, অপরিকল্পিত উন্নয়ন প্রভৃতি কারণে আবহমান কালের প্রকৃতি ও জীবনের ঐকতান বিনষ্ট হচ্ছে। এর ফলে দূষণ; দখল; নদী-জলাভূমি-অরণ্যবিনাশ; বন্যপ্রাণী, পাখি, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাস ধ্বংস; প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতা; জলবায়ু পরিবর্তনের অনিবার্য অভিঘাত; অতিমারি রোগ ও শোক; এবং দারিদ্র্যসহ নানান অবাঞ্ছিত দুর্বিপাক প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। তাই তাগিদ এসেছে মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়ার এবং স্লোগান ধরার- আমাদের 'একটাই পৃথিবী'। এই 'একটাই পৃথিবী' সকলের জন্য এবং সকলের যত্নেই এই পৃথিবীকে সুরক্ষা করতে হবে।

আমরা আনন্দিত, অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি স্মরণিকা প্রকাশ হচ্ছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে স্মরণিকায় মূল্যবান বাণী প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রতি পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী; উপমন্ত্রী; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি; সম্মানিত সচিব; এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ও মূল্যবান বাণী প্রদান করেছেন। এ জন্য তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। লেখা দিয়ে যারা স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্মরণিকা সম্পাদনা ও প্রকাশে সহযোগিতা প্রদানকারী সহকর্মীদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্মরণিকায় যাদের তোলা ছবি ব্যবহার করা হয়েছে তাদের প্রতিও রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা।

এই স্মরণিকায় প্রকাশিত সকল লেখায় সম্মানিত লেখকদের পর্যবেক্ষণ, মতামত, পরামর্শ ও সুপারিশ একান্তই তাদের নিজস্ব।

মোঃ হুমায়ুন কবীর

দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে
একাদশ জাতীয় সংসদের
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটির
মাননীয় সংসদ সদস্যগণের
সদয় দিকনির্দেশনা এবং পরামর্শের জন্য
আমরা কৃতজ্ঞ

সাবের হোসেন চৌধুরী
সভাপতি

মোঃ শাহাব উদ্দিন
সদস্য

বেগম হাবিবুন নাহার
সদস্য

আনোয়ার হোসেন
সদস্য

নাজিম উদ্দিন আহমেদ
সদস্য

তানভীর শাকিল জয়
সদস্য

জাফর আলম
সদস্য

মোঃ রেজাউল করিম বাবলু
সদস্য

খোদেজা নাসরিন আক্তার হোসেন
সদস্য

মোঃ শাহীন চাকলাদার
সদস্য

সূচি

চিত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম			**১৭-৩৪**
বাংলা প্রবন্ধ			**৩৭-১০৭**
১.	পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নে পরিবেশ অধিদপ্তর	ড. আবদুল হামিদ	৩৭
২.	প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন	প্রফেসর ড. এম শমশের আলী	৪২
৩.	জীবনবৃক্ষ ও আপনার জীবন	ইনাম আল হক	৪৫
৪.	বাড়ি নির্মাণে পোড়া ইটের বিকল্প 'হলো ব্লক': কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা	মোঃ জাফর সিদ্দিক	৪৮
৫.	আমি বাংলায় গান গাই	মোঃ মুকিত মজুমদার বাবু	৫১
৬.	প্রেক্ষিত বায়ুদূষণ: আমাদের করণীয়	সৈয়দ নজমুল আহসান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব	৫৬
৭.	বাংলাদেশ বিপজ্জনক রাসায়নিক ডিডিটিমুক্ত হতে যাচ্ছে	ফরিদ আহমেদ এহসান কবির	৬১
৮.	প্লাস্টিক বর্জ্য দূষণ এবং করণীয়	ড. মিহির লাল সাহা	৬৩
৯.	প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবনে: নদী-বৃক্ষ-পাখি সুরক্ষায় করণীয়	অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদ	৬৫
১০.	চিকিৎসা বর্জ্যের ঝুঁকি: বিশ্ব ও বাংলাদেশ	মোঃ আব্দুল হাই	৬৭
১১.	বদ্বীপ পরিকল্পনা ও বাংলাদেশের কৃষি	ড. সুরাইয়া পারভীন	৭২
১২.	একটিই মাত্র পৃথিবী আমাদের	হাসান জাহিদ	৭৫
১৩.	পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর	ফরিদ আহমেদ	৭৮
১৪.	হাওর অর্থনীতি: সমস্যা ও সম্ভাবনা	মোহাম্মদ এমরান হোসেন	৮১
১৫.	শব্দদূষণ: একটি নীরব ঘাতক এবং আমাদের করণীয়	সৈয়দ ফরহাদ হোসেন	৮৮
১৬.	সুন্দরবনের মৎস সম্পদ	ড. আসম হেলাল সিদ্দীকি	৯১
১৭.	বগুড়ার গাবতলি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কমিটির পরিচিতি	মোঃ ফজলে বারী	৯৩
১৮.	বিশ্ব নাগরিক হয়ে ওঠার চেতনাবোধ সম্প্রসারিত হোক ও জাগ্রত থাকুক সবার মাঝে	বিধানচন্দ্র পাল	৯৬
১৯.	আমাদের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও গ্রীষ্মের তাপদাহ	মোঃ আজহারুল ইসলাম খান	৯৮
২০.	রংপুরের নদী, তোমরা কি কোনো কথা কও?	মোঃ রাইহান হোসেন	৯৯
২১.	পরিবেশ বাঁচাতে হবে মানুষের প্রয়োজনে	আফতাব চৌধুরী	১০১
২২.	নদীসত্তায় আগামীর বাংলাদেশ	ফাতেম-তুজ-জোহরা	১০৪
২৩.	শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে চাই জনসচেতনতা	জিয়াউর রহমান লিটু	১০৬

সূচি

Einglish Articles **111-140**

1.	Regenerative Agriculture – An Important Restoration Tool of Climate Change Impacts in Bangladesh	Professor Dr. Md. Shafiqul Bari	111
2.	Constructed Wetlands: A Nature Based solutions for Waste Water Treatment	Fahim Muntasir Rabbi Md. Hasibur Rahaman K. M. Delowar Hossain	113
3.	Achieving Sustainable Development Goals in Harmony with Nature in Bangladesh	Dr. Gulshan Ara Latifa	115
4.	Progress Activity of Bangladesh with UNCCD COP 15	Dr. Md. Yousuf Ali	119
5.	Chemical Management: A significant way to superintend	Nazim Hossain Sheikh	124
6.	Quest for Sustainable development in the Energy Sector through the Provision of Eco-development	Md. Hafiz Iqbal	132
7.	Urban Agriculture for Sustainable Urban Planning	T M Arifur Rahman	135
8.	Sustainable Transportation	Kazi Nazmul Mahmud	138
9.	The Implications of Having `Only One Earth’	Raisa Binte Huda Tayeba Tahsin Nawar	140

কবিতা **১৪৭-১৫০**

১.	একটাই জীবন একটাই পৃথিবী	মনিরুজ্জামান বাদল	১৪৭
২.	একটাই পৃথিবী প্রকৃতির ঐক্যতানে টেকসই জীবন	সুকুমার বিশ্বাস	১৪৮
৩.	পার্বত্য প্লাবন	ভদ্র সেন চাকমা	১৪৯
৪.	সবুজ ছায়া সবুজ মায়া	গুরুদেব কুমার সরকার	১৫০

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষে শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শ্রেষ্ঠ শিশুদের চিত্র **১৫১-১৫২**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯ গ্রহণ করছেন
ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯ গ্রহণ করছেন
প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯ গ্রহণ করছেন
ড. মোবারক আহমদ খান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯ গ্রহণ করছেন
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ নভেম্বর ২০২১ স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে বিশ্বনেতাদের উপস্থিতিতে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে কপ-২৬ মূল অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন

ছবি: পিআইডি/ফোকাস বাংলা নিউজ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ নভেম্বর ২০২১ স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে কপ-২৬ এর কমনওয়েলথ প্যাভিলিয়নে 'সিভিএফ- কমনওয়েলথ হাই-লেভেল ডিসকাসন অন ক্লাইমেট প্রসপারিটি পার্টনারশিপ' আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ প্রদান করেন

ছবি: পিআইডি/ফোকাস বাংলা নিউজ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ নভেম্বর ২০২১ স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে কপ-২৬ সম্মেলন কেন্দ্রে স্কটিশ প্যাভিলিয়নে "উইমেন এন্ড ক্লাইমেট চেইঞ্জ" শীর্ষক হাই-লেভেল প্যানেলে আলোচনায় বক্তব্য প্রদান করেন
ছবি: পিআইডি/ফোকাস বাংলা নিউজ

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি.

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, এম.পি.

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে কপ-২৬ এ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মহোদয়সহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

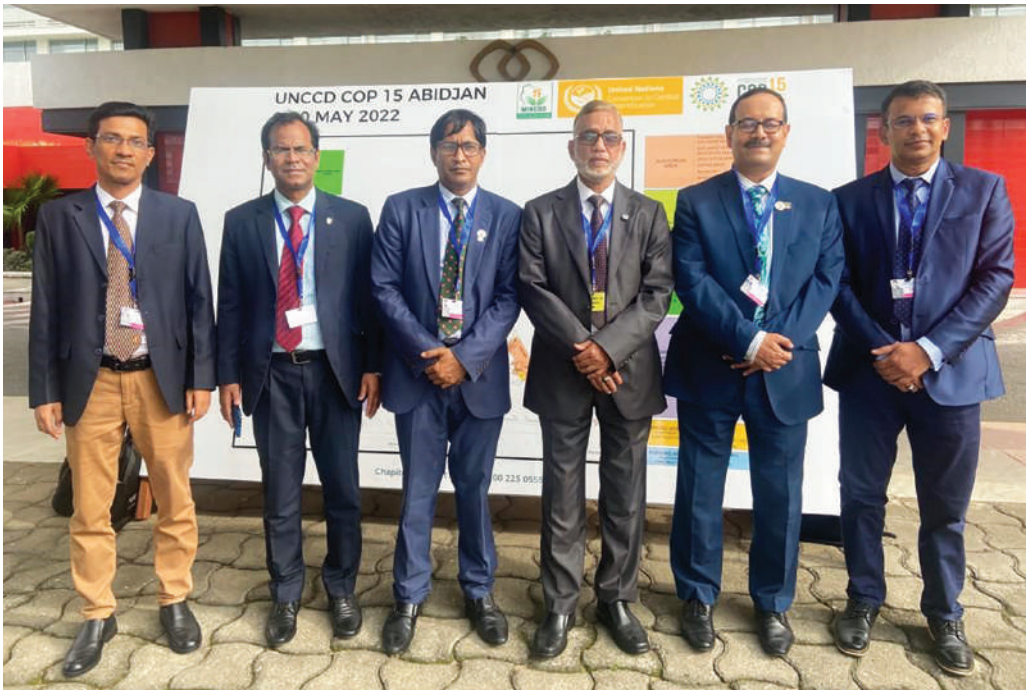

UNCCD এর কপ-১৫ এ পরিবেশে, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রাণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও মন্ত্রাণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (২০ জানুয়ারি ২০২২) প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রাণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন এমপি মন্ত্রাণালয়ের নবযোগদানকৃত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পের প্রারম্ভিক কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যাপক ডাঃ প্রাণ গোপাল দত্ত, এম.পি.

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত পরিবহন চালক ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর

বায়ুদূষণ রোধে অভিযান

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও রোধে সচেতনতা ক্যাম্পেইন

পরিবেশ দূষণকারী ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান

শব্দদূষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

Continuous Air Monitoring Station (CAMS)

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বায়ুর মানমাত্রা পরিবীক্ষণ

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হাকালুকি হাওর: জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওর

গ্রাম সংরক্ষণ দলের অংশগ্রহণে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সৃজিত ও সংরক্ষিত
কক্সবাজারের নুনিয়ারছড়া ম্যানগ্রোভ বন

কক্সবাজার জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সামুদ্রিক কাছিম সংরক্ষণ কার্যক্রম

সেন্টমার্টিন দ্বীপের পাথরময় জোয়ার ভাটা এলাকা উপকুলীয় ও সামুদ্রিক প্রাণীর গুরুত্বপূর্ণ আবাস

দেশের সর্বদক্ষিণের ভূখণ্ড সেন্টমার্টিন দ্বীপের ছেড়াদিয়াকে ক্ষতিকর পর্যটনের কবল থেকে সুরক্ষা করতে হবে

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রতিবেশ-ভিত্তিক অভিযোজন (Ecosystem-Based Adaptation)-এর জন্য বরেন্দ্র এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগী সংস্থা হিসেবে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি পুকুর পুনঃখনন ও বৃক্ষরোপণ

বাংলা প্রবন্ধ

পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নে পরিবেশ অধিদপ্তর

ড. আবদুল হামিদ*

পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশগত মান উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী সরকারি, বেসরকারি ও জনগণ পর্যায়ে সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং এ বিষয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (United National Environment Program-UNEP) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউনেপ-এর উদ্যোগেই ১৯৭২ সাল থেকে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো-Living sustainably in harmony with nature যার বাংলা ভাবানুবাদ হচ্ছে "প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন"।

১৯৭৪ সনের স্টকহোম কনফারেন্সের প্রতিপাদ্য `Only One Earth'-দীর্ঘ ৫০ বছর পর এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হিসাবে পুনর্বার নির্ধারিত হয়েছে এমন এক সময়ে যখন পৃথিবী নামক গ্রহটি আজ মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যায় জর্জরিত। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের স্লোগান `Only One Earth' (যার বাংলায় ভাবানুবাদ করা হয়েছে ঃ একটাই পৃথিবী)। ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণ, অদক্ষ ও অপচয়মূলক প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার পৃথিবীর অস্তিত্বকে হুমকিতে ফেলেছে। বিগত বছরগুলোতে পৃথিবীব্যাপী প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং শিল্প-উন্নয়নের পাশাপাশি বেড়েছে প্রকৃতি এবং জীববৈচিত্র্য ধবংসের হার। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির তথ্যমতে ১৯০০ সালে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের পরিমাণ ছিলো মাত্র ৭ মিলিয়ন টন, যা ২০৫০ সাল নাগাদ ১৪০ মিলিয়ন টনে দাড়াবে। এ প্রবণতাকে প্রতিহত করা না হলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ প্রাপ্যতা এবং প্রকৃতির উপর সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমন করার স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে যাবে। এ বাস্তবতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। মূলত এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মানুষকে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া ও তার সাথে মেলবন্ধন পুনঃস্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন। জাতিসংঘের তথ্য মতে, আগামী দশ বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০ লক্ষ প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৭০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রতি তিনটির মধ্যে একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে। গত ৫০ বছরে গড়ে ৬০ শতাংশের বেশি বন্যপ্রাণী হ্রাস পেয়েছে। সে হিসেবে গত ১০ মিলিয়ন বছরের তুলনায় বর্তমানে প্রজাতি বিলীন হওয়ার গড় হার ১০ থেকে ১০০ গুণ বেশি। বায়োস্ফিয়ার, পৃথিবীতে যা জীবনের আধার, তা অস্বাভাবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পৃথিবীর ৭৫ শতাংশ ভূভাগ পরিবর্তিত হয়েছে। বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ সামুদ্রিক এলাকা আজ পরিবেশগত হুমকির সম্মুখীন। শুধুমাত্র ২০১০ সাল হতে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে ৩২ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি ধ্বংস হয়েছে। আমরা যদি এই পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ করতে না পারি তাহলে ব্যাপকভাবে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণে মানুষের খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমগ্র বাস্তুতন্ত্রে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং মানুষসহ পৃথিবীর সকল প্রাণের অস্তিত্ব বিলীন হবে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়ানো এবং লক্ষ লক্ষ প্রজাতির বিলুপ্তি রোধ করার লক্ষ্যে ২০২১-২০৩০ দশককে UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030 ঘোষণা করা হয়েছে।

পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বিশ্বের সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ দেশের জনজীবনের বিশাল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের কারণে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়ছে। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন অভিঘাত এই সমস্যাকে আরো তীব্র করে তুলছে। এ প্রতিকূলতার বিপরীতে বাংলাদেশ সরকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ অন্যতম রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এখন আমাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের অন্যতম হলো পরিবেশ সুরক্ষা। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ বিষয়ক কারিগরি সংস্থা হিসেবে দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশের সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নে পরিবেশ অধিদপ্তর সীমিত জনবল নিয়ে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ বিপর্যয় রোধে পূর্ব-সতর্কতামূলক নীতি (Precautionary Principle) অনুসরণ, দূষণকারীদের দায় পরিশোধের নীতি (Polluters Pay Principle) এবং সাধারণ কিন্তু পৃথকীকৃত দায়-দায়িত্ব (Common but Differentiated Responsibility)-এর ভিত্তিতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং

*মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দৃঢ় ভূমিকা পালন করে চলছে। সুষ্ঠু ও দ্রুত পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন গ্রহণ ও নিস্পত্তির জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনলাইনে ছাড়পত্র গ্রহণ ও প্রদান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর সংস্থাসহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালাসহ সার্বিক কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো যেন যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, মতামত এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। অন্যদিকে, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতি বছর ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন অর্থাৎ বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশসম্মত বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের পরিবেশবান্ধব নীতি ও কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় যে সকল সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম

দেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকার কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীসহ ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এ সকল এলাকার পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে "প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬" প্রণয়ন করেছে। সেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং টেকসই পর্যটন নীতিমালা ২০২২ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সমাজভিত্তিক অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। জলাভূমি ও পরিযায়ীপাখি (Migratory Birds) সংরক্ষণে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১৭" জারী করা হয়েছে। পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে "জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গৃহীত আন্তর্জাতিক কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০ (যা আইচি বায়োডাইভারসিটি টার্গেটস হিসাবে অভিহিত) এর আলোকে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০১৬-২০২১ (National Biodiversity Strategy and Action Plan, NBSAP 2016-2021) প্রণীত হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সনদের অন্তর্গত কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটির সদস্য দেশ হিসাবে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কমকাঠামো (National Biosafety Framework) ২০০৭ ও জীবনিরাপত্তা গাইডলাইন্স ২০০৮ প্রণয়ন এবং জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ জারি করাসহ জীবনিরাপত্তার বিষয়টি বাস্তবায়নে সহায়ক হিসাবে পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি অত্যাধুনিক GMO Detection Lab প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ২০১০-২০১৫ সময়ে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জনগণ এবং অন্যান্য সহযোগী সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ-তে কমিউনিটি বেইসড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলোজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন অ্যান্ড সোশাল প্রটেকশন প্রজেক্ট (সিবিএ-ইসিএ প্রকল্প) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজনের জন্য জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত 'ইকোসিস্টেম বেইসড এপ্রোচেস টু অ্যাডাপটেশন (ইবিএ) ইন দি ড্রাউট বারিন্দ ট্র্যাক্ট অ্যান্ড হাওর ওয়েটল্যান্ড' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীব সম্পদের সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার তৈরির জন্য জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত 'সুনীল অর্থনীতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীবসম্পদের পরিমাণ নিরূপণ' শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। Sustainable Land Management (SLM) এর জন্য জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ "এস্টাবলিশিং ন্যাশনাল ল্যান্ড ইউজ এন্ড ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন প্রোফাইল টুওয়ার্ডস মেইনস্ট্রিমিং এসএলএম প্র্যাক্টিস ইন সেক্টর পলিসিস (ইএনএএলইউএলডিইপি/এসএলএম)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পরিবেশ সুরক্ষায় বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলাসহ ভবিষ্যতে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় পেস্টিসাইডের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান ৫০০ টন ডিডিটির পরিবেশসম্মত ডিসপোজালের জন্য মার্চ ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে 'পেস্টিসাইড রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্প

বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। UNFCCC-এর COP16 ও COP17 এর সিদ্ধান্ত পরিপালনের লক্ষ্যে প্রথম বাইয়েনিয়াল আপডেট রিপোর্ট প্রস্তুতির জন্য 'বাংলাদেশ ফার্স্ট বাইয়েনিয়াল আপডেট রিপোর্ট টু দ্য ইউএনএফসিসিসি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। Green House Gas Inventory মূল্যায়ন, রিপোর্টিং ও যাচাই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য জানুয়ারী ২০২০-জানুয়ারি ২০২৩ মেয়াদে 'Strengthening Capacity for Monitoring Environmental Emission Under the Paris Agreement in Bangladesh Project' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিবেশগত সমস্যা, চ্যালেঞ্জ, সমস্যা সমাধানের উপায় এবং সরকারি বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবেশগত টেকসইকরণ ও রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন বিশ্লেষণ করে 'বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনিবিলিটি অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশান (বিইএসটি) প্রিপারেশন' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সমুদ্র প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দূষণের প্রভাব পরিবীক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য "Assessment of Coastal and Marine Biodiversity Resources and Ecosystems to Implement the Blue Economy Action Plan" নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ প্রাকৃতিক সম্পদ (পানি, বায়ু) ব্যবস্থাপনা। এর অংশ হিসেবে অধিদপ্তরের গবেষণাগারসমূহ কর্তৃক নিয়মিত ভূপৃষ্ঠস্থ (নদী, লেক), ভূগর্ভস্থ পানির মান পরিবীক্ষণ করা হয়। এছাড়া শিল্পকারখানা/প্রকল্পের উদ্যোক্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ ও তরল বর্জ্যের গুণগতমান পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত সার্পোট সার্ভিস প্রদান করা হয়। অধিকন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির সাথে যৌথ বা এককভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(খ) শিল্পদুষণ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

পানিদূষণ রোধে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে ETP স্থাপনে বাধ্য করা হচ্ছে। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ইটিপি স্থাপনযোগ্য ২৬৭৮টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২২৪৯টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৪ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে মোট ৬০০টি তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ২০১০ সালের ১৩ জুলাই হতে পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণকারীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ধারা ৭ মোতাবেক এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শুরু করে। বিগত ১৩ জুলাই ২০১০ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ক্ষতিসাধনের জন্য ৯,১৭৮টি দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৪৫৪.৭৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক ২১৯.৮৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

পলিথিন ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকসমূহ বিভিন্ন পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানের সংখ্যা ১,৮৯৭টি এবং দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ২,৮৫৫টি, জরিমানা ধার্য করা হয়েছে ৪,৬২,০০,৮০০(চার কোটি বাষট্টি লক্ষ আটশত টাকা) টাকা, জরিমানা আদায় করা হয়েছে ৪,৬১,৩০,৮০০ (চার কোটি একষট্টি লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশত টাকা) এবং জব্দকৃত পলিথিনের পরিমাণ ১৫৫২.৮১৮ মেট্রিক টন। এছাড়াও ১৬৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট ও ভ্রাম্যমাণ আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত শব্দদূষণের দায়ে মোট ৯৮টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৬৬১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৭,০৭,৭০০টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত আরোপ করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(গ) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্ত ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে মোট ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (Continuous Air Monitoring Station) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আরও ১৫টি কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (C-CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। এই ৩১টি CAMS ও C-CAMS-এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বায়ুমান পরিবীক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বায়ুদূষণ হ্রাস এবং মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কমানোর লক্ষ্যে "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)"-এর আলোকে সনাতন প্রযুক্তির বায়ুদূষণকারী ইটভাটার কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে মাটির বিকল্প উপাদানে তৈরি বিভিন্ন ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ঢাকা ও তার আশেপাশের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মহামান্য আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক একটি নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিবেশ দূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও পুলিশের সহযোগিতায় নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। অবৈধ পরিবেশ দূষণকারী ইটভাটার বিরুদ্ধে চলতি অর্থবছরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ২০,৭১,৫৮,৫০০ (বিশ কোটি একাত্তর লক্ষ আটান্ন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া ৭৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ৭৬১টি অবৈধ ইটভাটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সরকারি নির্মাণ, মেরামত সংস্কার কাজে (সড়ক ও মহাসড়ক ব্যতীত) ভবনের দেয়াল ও সীমানা প্রাচীর, হেরিংবোন কোন বড় রাস্তা এবং গ্রাম সড়ক টাইপ-বি এর ক্ষেত্রে ইটের বিকল্প হিসাবে ব্লক ইট ব্যবহার বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সার্বিক বায়ুদূষণকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য একটি পূর্ণাঙ্গ "বায়দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২"-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার হাইড্রোক্লোরোফ্লোরোকার্বন (এইচসিএফসি) ফেজ-আউটের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ৫৫টি দেশ মিলে গঠিত Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে CVF সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নিজ নিজ রাষ্ট্রে Climate Prosperity Plan প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ভবিষ্যত প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার "Mujib Climate Prosperity Plan" প্রণয়ণ করছে, যা মূলত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য একটি কৌশলগত বিনিয়োগ কাঠামো। সর্বোপরি, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনে বিভিন্ন অভিযোজনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন (জিসিএ) এর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার UNFCCC-এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করছে।

UNFCCC-এর আওতায় বিগত ৩১ অক্টোবর ২০২১ হতে ১৩ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো শহরে অনুষ্ঠিত ২৬তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP 26) এর World Leaders Summit-এ ১২০টিরও বেশি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে Country Statement প্রদান করেন। এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন- বাংলাদেশের এনডিসি আপডেট, এবং ২০৪১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে মোট শক্তির ৪০ শতাংশ উৎপাদনের অভিপ্রায় সংক্রান্ত বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা, একনিষ্ঠতা, সুদূরপ্রসারী দিকনির্দেশনা সর্বোপরি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য তিনি ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার,"Champions of the Earth" অর্জন করেছেন।

(ঙ) বর্জ্য ও রাসায়নিক ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কার্যক্রম

দেশব্যাপী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে মনিটরিং ও পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি/বিধি বাস্তবায়ন সমন্বয়ের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা নামে একটি নতুন শাখা খোলা হয়েছে। ইতোমধ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এবং ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০২১ জারি করা হয়েছে। প্লাস্টিকের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন উপদেষ্টা কমিটি এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের নেতৃত্বে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্লাস্টিক/প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১০ বছর মেয়াদী Plastic Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপজ্জনক ও জাহাজভাঙ্গা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ এর বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় শর্তসাপেক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ আমদানির ছাড়পত্র প্রদানের কার্যক্রম চালু হয়েছে।

সমুদ্রের জলপথে এবং দেশের অভ্যন্তরের জলপথে দুর্ঘটনাজনিত তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণের দূষণ মোকাবেলার জন্য সরকার জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা ২০২০ (National Oil and Chemical Spill Contingency Plan-NOSCOP 2020) প্রণয়ন করেছে

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্য পরিবেশ অধিদপ্তর পক্ষকালব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং শিশু-কিশোদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিবসের মূল অনুষ্ঠান তথা পরিবেশ মেলা উদ্বোধন করবেন এবং ২০২০ ও ২০২১ সালের জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করবেন। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অধিকন্তু পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সেমিনার ও রাউন্ড টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এ সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের পরিবেশ সুরক্ষার বার্তা সর্বসাধারণের নিকট পৌঁছানোর মাধ্যমে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যাপক জন অবহিতকরণ করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হলেও প্রকৃতির সাথে আমাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং নির্ভরশীলতার বিষয়টি আমরা যর্থাথ ও আশানুরূপভাবে অনুধাবন করতে পারিনি। পরিবেশ অধিদপ্তর সীমিত জনবল দিয়ে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এটি প্রমাণিত সত্য যে আমরা যদি প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করি তাহলে প্রকৃতিও বৈরি আচরণ করবে। পরিণামে দেখা দেবে বিভিন্ন মহামারী, অতিমারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই বাস্তবতায়, বিশ্বসম্প্রদায় তথা আমাদেরকে পুনরায় চিন্তা করতে হবে যে আমরা প্রকৃতি, প্রতিবেশ, প্রজাতিবৈচিত্র্য, সর্বোপরি পরিবেশের প্রতি কীভাবে আচরণ করছি। এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রকৃতিতেই রয়েছে আমাদের সুরক্ষা। তাই, প্রকৃতিকে বাঁচানোর এখনই সময়। এ জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সহযোগিতা এবং প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যকীয়। আমাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টাই পারে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে।

প্রকৃতির ঐক্যতানে টেকসই জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন

প্রফেসর ডক্টর এম শমশের আলী*

ভূমিকা :

এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে সকল দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীদের আবার একবার স্মরণ করাতে চাই যে পাটই আমাদের স্বাধীকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আমরা পরিবেশের অবক্ষয় রোধের কাজে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেই ভূমিকাকে আবার কাজে লাগাতে চাই। এ প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছে কিন্তু পাট তার হারানো মর্যাদা এখনো ফিরে পায়নি। পাটের ব্যাগ বঙ্গসন্তানের হাতে যেন আবার উঠে আসে এবং এই পাটের ব্যাগ বিশ্ববাজারে আমরা যেন চালু করতে পারি এই উকেণশ্যে এখানে কয়েকটি সুপারিশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছি-

সুপারিশ সমূহ :

১. পকেটে রাখার মত ৫, ১০, ১৫ কেজি ইত্যাদি ওজন বহন করার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাগ বাংলাদেশে প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ এবং এমনকি শিক্ষিত মানুষের পরিবেশ সচেতনতার অভাবে এই ব্যাগগুলো এখনও তেমন ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এই ব্যাগগুলো ফাঁকফোকর ওয়ালা এবং এদের ওজন কম। এর একটি নমুনা নিচে দেয়া হল-

ফাঁকফোকর এত ছোট যে বিদেশে যখন কোন কিছু বিক্রি করা হয় তখন যে কাগজ দিয়ে আচ্ছাদন করা হয় তা এই ফাঁকফোকর এর চাইতে অনেক বড়। তাই বিদেশেও এই ব্যাগগুলো সমাদৃত হবে এই জন্য যে এগুলো শুধু এককালীন ব্যবহারের জন্য নয়। এগুলো বারবার ব্যবহার করা যেতে পারে। অবিলম্বে বাংলাদেশের কাঁচাবাজার গুলোতে এই ব্যাগ প্রবর্তন করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সিটি মেয়রগণ কাঁচাবাজারে ঢোকার পথে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এই ব্যাগগুলো রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন একজন বিক্রয়কারী সহ। এগুলোর মূল্য বর্তমানে ৫/১০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যেহেতু এগুলো বার বার ব্যবহার করা যাবে সেহেতু এবং পরিবেশ রক্ষার্থে এই মূল্য বহন করার ক্ষমতা অসাধ্য হবে না।

২. এই ব্যাগগুলো চালু করতে গেলে পলিথিন ব্যাগ জব্দ করতে হবে। এইজন্যে বাংলাদেশ সরকারকে নতুন কোনো আইন করতে হবে না। সরকার বেশ কয়েক বছর আগেই ৫৫ মাইক্রন পুরুত্বের নিচে যে কোনো পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছে। এই নিষিদ্ধকরণ বিশ্বনন্দিত হয়েছে। কিন্তু এই আইনের প্রয়োগ হচ্ছে না। ফলে বাজারে পাতলা পলিথিন ব্যাগ এর ব্যবহারে পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়েছে এবং হচ্ছে।

*প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী

Polythene bags clogging up city's drains, Dhaka Tribune June 17th, 2015

পরিবেশ অবক্ষয় রোধ করতে হলে অবিলম্বে পলিথিন ব্যাগ জব্দ করতে হবে। এইজন্যে বাজারে পলিথিন ব্যাগ যারা আনছে তাদেরকে গ্রেফতার বা জরিমানা করে লাভ হবে না। এই পাতলা ব্যাগগুলো তৈরি করছে যে মেশিন তা অবিলম্বে জব্দ করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনেক বলিষ্ঠ পদক্ষেপই জনগণ গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মেশিন জব্দ করার ব্যাপারে একটি অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন, যন্ত্রের মালিক যতই প্রভাবশালী ও ক্ষমতা সম্পন্ন হোক না কেন।

৩. এই জব্দ করার কাজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তরকে আরো সক্রিয় ও ক্ষমতা সম্পন্ন করতে পারেন। যাতে তারা প্রয়োজনে পুলিশের সহায়তা পেতে পারে। প্রয়োজনবোধে "পরিবেশ পুলিশ" নামে বাংলাদেশ পুলিশের একটি আলাদা শাখা গঠন করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে শুদ্ধাচারে কোনো গাফিলতি দেখলে পর্যাপ্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. পাটের ব্যাগগুলো যাতে বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় সেজন্য সরকার দেশে কয়েকটি পাট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র পাটের "Yarn" তৈরির জন্য নির্দিষ্ট করতে পারে। Yarn না পেলে পাট ব্যাগের প্রচলন হবে না এটাই আসল কথা।

৫. দেশের পাটের ব্যাগ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন এনজিওকে উৎসাহিত করতে হবে। এই ব্যাগ তৈরির কাজ যান্ত্রিকভাবে করা যায় আবার হাত দিয়েও করা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েদের নিয়োগ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং মেয়েদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে। এ বিষয়ে এনজিওগুলোকেও বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬. সরকারি এবং বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে পাটের ব্যবহারের জন্য প্রতিদিন নিয়মিত scroll করলে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

৭. একথা সুবিদিত যে পূর্ণ বয়স্কদের অভ্যাস বদল সাধারণত সহজ হয় না। সেজন্য আমাদের নজর দিতে হবে তরুণ প্রজন্মের ক্ষেত্রে। পাটের ব্যাগের পরিবেশ বান্ধবতা তুলে ধরার জন্য পাঠ্যপুস্তকে পাটের ব্যবহার সংক্রান্ত একটি অধ্যায় থাকতে হবে।

৮. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে সকল সদস্যকে তাদের নিজ এলাকায় এই পলিথিন ব্যাগ কীভাবে পুকুর নদ নদী খাল বিল ও এমনকি শহরের পানি বহনকারী পাইপগুলোকে কীভাবে clogging বা অবরুদ্ধতা সৃষ্টি করেছে তা নিজ চোখে দেখে যেনো জাতীয় সংসদে রিপোর্ট প্রদান করার অনুরোধ করতে পারেন।

৯. অর্থনীতিবিদরা পাট ব্যাগ প্রস্তুতিকরণ ক্ষেত্রে এবং বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে যদি economic feasibility নিয়ে প্রশ্ন করেন তবে তাদেরকে বোঝাতে হবে যে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখার চাইতে আর অন্য কোন feasibility নাই, বৈদেশিক বাজারের কথা ছেড়ে দিলেও শুধুমাত্র বাংলাদেশে নিত্য প্রয়োজনে কোটি কোটি ব্যাগের প্রয়োজন হয়।

১০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা নির্দেশ দিতে পারেন এই মর্মে যে ,যা কিছু পাট দিয়ে করা সম্ভব তা অন্য কিছু দিয়ে করা যাবে না। প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য BMW গাড়ির একটি নির্দিষ্ট অংশে পাটের ব্যবহার চালু হয়েছে। আমরা কেন পাটের পর্দা পাটের সোফা কেন ব্যবহার করতে পারব না, আল্লাহতালা এই পাটকে একটা বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে আমাদের দেশকে দিয়েছেন। আমরা যেন এ কথা না ভুলে যাই।

পরিশেষ :

পরিশেষে একথা বলতে চাই যে পাট নিয়ে আর কালক্ষেপণ করার সময় নেই। পরিবেশ না বাঁচলে আমরা বাঁচবো না। এটাই sustainable development এরও একটা মূল কথা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন এই যে তিনি যেন পাটের ব্যাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে উপরোক্ত ১০ দফা সুপারিশ সদয় বিবেচনা করেন এবং যদি তা করেন দেশবাসী তার সিদ্ধান্তগুলো মেনে নেবে। বাংলাদেশ কখনোই পরিবেশের দিক দিয়ে সর্বনিম্ন অবস্থায় থাকবে না। থাকবে পরিবেশবান্ধব দেশের তালিকার শীর্ষে।

জীবনবৃক্ষ ও আপনার জীবন

ইনাম আল হক*

একটা জীবনগাছের চারা দেখলাম বনানীতে। চেইনলিঙ্ক বেড়ার ফাঁক দিয়ে ডাল ছাড়ছে গাছটি। আমার প্রতিবেশীদের দেখালাম সে গাছ। তাঁরা বললেন, "এটা আগাছা, আমরা লাগাইনি।" জ্ঞান দেওয়ার একটা সুযোগ পেলাম। বললাম, "পাখি লাগিয়েছে এ গাছ। এর নাম জীবন, জিনাল অথবা বনজিগা।"

জীবন নামের এ বৃক্ষের কথা আপনিও হয়ত এই প্রথম জানলেন। যদিও আমাদের পাহাড়ি বন ভরে আছে এ গাছে। সমতলেও কম নেই এই জীবনবৃক্ষ। এমনকি সুন্দরবনেও দেখা যায় জীবনগাছ। টিকে থাকার দারুণ ক্ষমতা এ গাছের।

টেকার ক্ষমতা ছাড়া অখ্যাত এই জীবনগাছের আর কী গুণ আছে? এ গাছ আমাদের কী কামে লাগে? এর ফুল, ফল ও কাঠের মুল্য কী? এর শিকড়, বাকল কিংবা পাতায় কোনো ঔষধিগুণ আছে কি? কীভাবে এ গাছকে আপনি একটি মূল্যবান উদ্ভিদ বলবেন?

এ সবই সঙ্গত প্রশ্ন। নগর-জীবনে গাছ নিয়ে তো আরও অনেক প্রশ্ন ওঠে। গাছের সব ঝরাপাতা ঝাড়ু দিতে বছরে কত খরচ হবে? গাছের কোনো বেয়াড়া শিকড় কখনও দেয়াল ভেঙে ফেলবে কি? গাছের চূড়াটি ওভারহেড বিদ্যুৎ-লাইন ছোঁবে কত দিনে? অন্য গাছের পাশে এটা মানাবে তো? ইত্যাদি।

চেইনলিঙ্ক বেড়ার ফাঁকে জীবনগাছ

প্রতি বছর নগরে বৃক্ষরোপণ অভিযান হয়। আমরা গাছ লাগানোর জায়গা খুজি। নতুন চারা লাগানোর জায়গাই তো নেই। গতবার মেহগনির অনেকগুলো চারা লাগানো গেল না জায়গার অভাবে। তার মধ্যে এই জীবনগাছ এলো কোথা থেকে! বনানীর জমি লক্ষ টাকা বর্গফুট। এমন জমিনে কি জীবনগাছ হতে দেওয়া যায়!

জীবনগাছের পক্ষে কীই বা আমি বলতে পারি! এর কাঠ খুবই নরম। সে কাঠ আগে ম্যাচবাক্স তৈরির কাজে আসত; এখন কেউ ব্যবহার করে না। সুবিদিত কোনো ঔষধিগুণ নেই এ গাছের। পাহাড়ি লোকে বলেন, এর পাতা খেলে দাঁতব্যাথা সারে; তাতে সায় নেই কোনো দন্ত-চিকিৎসকের। এর ছোট্ট সবুজ ফুল ও ফল মানুষের ভোগে লাগে না মোটেই।

তবে জীবনবৃক্ষের ফল পাখিতে খায়। গাছের প্রতিটি পাতার গোড়া ছোট্ট সবুজ ফলে ভরে থাকে। নানা প্রজাতির পাখি তা খেতে ছুটে আসে।

*পাখি পর্যবেক্ষক

বুলবুল থেকে হরিয়াল, সবাই এই ফলে আসক্ত। পাখিদের পাকস্থলীতে ঢুকেই তো ফলের বীজগুলো চলে যায় দূর-দুরান্তে। তাই, বনানীতও গজিয়ে ওঠে জীবনবৃক্ষ।

কয়েক জাতের প্রজাপতি ডিম দেয় জীবনবৃক্ষের পাতায়। ডিম ফুটলে এ গাছের পাতা খেয়ে শুঁয়োপোকা বড় হয়। এই শুঁয়োপোকা খেতে আসে অনেক জাতের পাখি। ক্ষুদে পাখির মধ্যে আসে টুনটুনি, প্রিনা, ধলাচোখ ও ফটিকজল। এছাড়াও আসে সাহেলি, বেনেবউ, হরবোলা ও কাবাসি। শীতকালে এদের পাশে নেমে আসে ২৫ প্রজাতির পরিযায়ী পক্ষী - ফুটকি ও চুটকি পরিবারের ছোট ছোট অনেক পাখি।

আপনার মনে হয়ত এখন একটি প্রশ্ন উঠেছে। জীবনবৃক্ষে প্রজাপতি ও পাখির আনাগোনা থাকলে আপনার কী লাভ? ও সব ক্ষুদ্র প্রাণী কখন আসে তা চোখেও পড়ে না। ওদের দেখে আপনার নয়ন সার্থক হয়েছে, তা বলার সুযোগ নেই। আমগাছ রাখলে আম মেলে। মেহগনি লাগালে মেলে কাঠ। কৃষ্ণচূড়া গাছ হলে ফুলের শোভা থাকে। জীবনবৃক্ষ থেকে কী মেলে?

এ প্রশের উত্তর হল, জীবনবৃক্ষে জীবন মেলে। এ বৃক্ষের ওপর নির্ভর করে অনেক কীটপতঙ্গ ও পাখির জীবন। তাদের ওপর নির্ভর করে আরও অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন। আর সে সব জীবনের ওপরই নির্ভর করে আপনার জীবন। ব্যাকটেরিয় থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির প্রাণ টিকে আছে বলেই আমরা টিকে আছি।

জীবন গাছে পোকা খুঁজছে টুনটুনি

আপনি হয়ত বলবেন যে আপনার প্রাণ নির্ভর করে বাজারে কেনা চালডাল, শাকশব্জি ও মাছমাংসের ওপর। কিন্তু একটা রসিকতা হিসেবেই কেবল তা বলতে পারেন। আপনি জানেন, ওসব দ্রব্য তৈরি হয় প্রকৃতিতে; বাজারে না। আর প্রকৃতিতে তৈরি সব কিছুর পিছনেই ব্যাকটেরিয়া, কীটপতঙ্গ ও পশুপাখির বিশাল অবদান থাকে। আম দেয় বলে আমগাছ আমাদের কাছে মূল্যবান। কিন্তু মাছি, মৌমাছি, পিঁপড়ে, বোলতা, ভীমরুলের মতো হাজারো কীটপতঙ্গ আমের মুকুলে পরাগায়ণ করে। তা না করলে গাছ থাকলেও আম হতো না। আমাদের বাজার হতো আমশুন্য।

আরও কথা আছে। আমের পরাগায়ণ করে যে কীটপতঙ্গ সেগুলো বাঁচে কী করে? সারা বছর তো আমের মুকুল থাকে না। এদের বেঁচে থাকার জন্য জীবনবৃক্ষের মতো গাছ লাগে। তাই শুধু ধান-গম আর আম-কাঁঠালের গাছ থাকলেই সব হয় না। জীবনবৃক্ষের মতো আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় গাছও চাই।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় লক্ষ হেক্টর জমিনে অ্যমন্ড (Almond) বাদাম গাছ লাগানো হয়েছে। সে গাছে ফুল এলে ট্রাক ভরে আনা হয় মৌমাছির বাক্স। নইলে ফুলের পরাগায়ণ হয় না; বাদামের ফলন পড়ে যায়। ওই বাদাম-বাগানে প্রাকৃতিক মৌমাছি নেই কেন? কারণ, লক্ষ হেক্টর জমিনে বাদাম ছাড়া আর কোন গাছ রাখা হয়নি। বাদাম ফুল শেষ হলে বছরের বাকি সময় মৌমাছিদের বেঁচে থাকার উপায় নেই। বাক্সভরা মৌমাছি ভাড়া করায় খরচ আছে। ত্যক্ত হয়ে বাগানমালিক এখন বাদাম গাছ কেটে বাগানের মাঝে মাঝে নানা জাতের 'আগাছা' লাগাচ্ছে। আশা করছে ভবিষ্যতে বাগানে কিছু প্রাকৃতিক মৌমাছি টিকে থাকবে এবং মৌমাছি ভাড়ার খরচ কমবে।

আমাদের দেশে লক্ষ হেক্টরের কোন আমবাগান নেই। ছোট ছোট আমবাগানের পাশে অন্য গাছ ও নানা ধরণের 'আগাছা' আছে। তাই এদেশের বাগানীদের আজও মৌমাছি ভাড়া করতে হয় না; প্রাকৃতিক পতঙ্গই এদেশে আমের মুকুল পরাগায়ণ করে।

বাংলাদেশের ফলবাগানে আর ফসলের ক্ষেতে তুচ্ছ কীটপতঙ্গ ও ক্ষুদ্র পাখিরা আমাদের অগোচরে পরাগায়ণের অতিজরুরী কাজটি করে যাচ্ছে। আর, নাম-না-জানা গাছপালা যাকে আমরা 'আগাছা' বলি তাই হলো কীটপতঙ্গ ও ক্ষুদেপাখিদের সূতিকাগার। আগাছাগুলো একেবারে হারিয়ে গেলে আমরা বুঝতে পারব ওগুলো কত প্রয়োজনীয় ছিল। যেমনটা ক্যালিফোর্নিয়ায় বাদাম-বাগানের মালিকরা টের পেয়েছে এতদিনে।

ক্যালিফোর্নিয়ার কাহিনীটা জানার পরও কি আমরা ওই একই মূর্খুমির পুনরাবৃত্তি এড়াতে পারব! আমরা কি মনে রাখতে পারব যে ফসলক্ষেত ও ফলবাগানের ওপর আমাদের জীবন যতটা নির্ভরশীল, বনবাদার ও ঝোপঝাড়ের ওপর তার চেয়ে কম নয়। ক্ষেত ও বাগানের অতিব্যাপ্তির সময়ে আজ পতিতজমি আর আগাছার প্রয়োজনীয়তাটা বরং বেশি। আম, মেহগনি ও কৃষ্ণচূড়া গাছ আপনার জীবন যতটা সমৃদ্ধ করে থাকে জীবনবৃক্ষ করে ততটাই, হয়তো আরও বেশি।

বাড়িনির্মাণে পোড়া ইটের বিকল্প 'হলো ব্লক':
কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

মোঃ জাফর সিদ্দিক*

প্রসঙ্গ কথা

আমাদের রাজধানী শহর ঢাকা বায়দূষণের দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলোর অন্যতম। দেশের অন্যান্য শহর, এমন কি কোন কোনো স্থানে গ্রামাঞ্চলের বায়ুদূষণও নিরাপদ মাত্রার চেয়ে বেশি।

বায়ুদূষণের একটি প্রধান কারণ জৈব জ্বালানি সৃষ্ট কার্বন ডাই অক্সাইড। এটি নিশ্বাসের বায়ুদূষিত করার পাশাপাশি পৃথিবীর উপরস্থিত বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। যা পরিণামে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের মাধ্যমে সৃষ্টি করে প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি মরুময়তা, লোনাপানির অনুপ্রবেশ এবং আরো নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্বিপাক। বায়ুদূষণ নানা গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা এবং বক্ষব্যধির প্রধান কারণ।

বায়ুদূষণের প্রধান কারণ ইটের ভাটাঃ

বাংলাদেশে বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান কারণ ইটভাটা। ইট তৈরিতে ভূমির উপরিভাগের উর্বর মাটি পুড়িয়ে ইটতৈরি করা হয়। এ মাটি অপসারণের পর জমির ফসল উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞানীদের মতে সাধারণ মৃত্তিকা থেকে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভূমির উপরস্থ ফসল উৎপন্ন হওয়ার উপযোগী মাটি তৈরি হতে তিন থেকে পাঁচশো বছর সময় লাগে। অথচ মাটি পুড়িয়ে ইটতৈরি করতে প্রতি বছর আমরা হাজার হাজার একর ফসলী জমি স্থায়ীভাবে নষ্ট করে ফেলি, এ ক্ষতি অপূরণীয়।

ইটের ভাটার দূষণ রোধে সরকার " ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৯" জারি করেছে। এ আইনমতে বায়ুদূষণ রোধে নির্মাণকাজে পোড়া ইটের ব্যবহার কমিয়ে বালি-সিমেন্ট-পাথর কণার মিশ্রনে তৈরি 'ব্লক' ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এ আইনটি জারি করা হলেও বাড়িঘর, ভবনাদি নির্মাণে এর ব্যবহার এখনো অত্যন্ত সীমিত। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাড়িঘর নির্মাণে হলো ব্লকের ব্যবহার এখনো তেমন নেই বললেই চলে।

পরিবেশ সচেতনতার ব্যক্তিগত উপলব্ধি

পরিবেশ অধিদপ্তরে দীর্ঘদিন কাজের সুবাদে আমি ইটের ভাটা আইনটির সংশোধনী প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলাম। তাই, এটির বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত অগ্রগতি না থাকায় মনে প্রচণ্ড দুঃখবোধ ছিল। প্রত্যাশা ছিল, যদি কখনো বাড়ি করার সুযোগ হয় তাহলে পোড়া ইটের বদলে ব্লক দিয়েই বাড়ি করব।

এ সুযোগ এলো চাকরি শেষে করোনাক্রান্ত সময়ে। উত্তরা ১৫ নম্বর সেক্টরের তিন কাঠার সরকার বরাদ্দকৃত একটি প্লটে বাড়ি করার জন্য 'গৃহ নির্মাণ ঋণ'ও মিলে গেল সময়মত। তাই, পাইলিং শেষে করোনাকালের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই কাজ এগিয়ে চলল। যারা ভবিষ্যতে পোড়ামাটির ইটের পরিবর্তে হলো ব্লক দিয়ে বাড়ি তৈরি করতে চান, আমার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই কিছুটা হলেও তাদের কাজে আসবে।

হলো ব্লকের সুবিধাঃ

ব্লক তৈরিকারক বা বিক্রেতাদের কাছ থেকে ব্লক দিয়ে বাড়ী নির্মানের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সুবিধার কথা জানা যায়, যেমনঃ

১. ব্লকের আকার ইটের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বড় হয় বলে এ দিয়ে দেয়াল নির্মানে সময় কম লাগে, ফলে নির্মাণ ব্যয় কম হয়।
২. ব্লকে নির্মিত দেয়াল তুলনায় মসৃন হয় বলে প্লাস্টারে সিমেন্ট কম লাগে, ফলে এটি অর্থ সাশ্রয়ী।
৩. ভবনের উজন কম হয় বলে এটি নির্মাণে রডের ব্যবহার কমানো যায়।
৪. ব্লকের ভিতর ফাঁপা বলে এটি তাপ অপরিবাহী। ফলে ব্লকের তৈরি কামরাটি গরমের সময় ঠান্ডা এবং শীতে উষ্ণ থাকে।
৫. একই কারণে ব্লকের তৈরি ঘরে বাইরের শব্দ কম প্রবেশ করে, এতে শব্দদূষণ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়।

*প্রক্তন পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, অরণ্য ফাউন্ডেশন

প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবনেঃ নদী-বৃক্ষ-পাখি সুরক্ষায় করণীয়

অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদ*

প্রকৃতির সমস্ত কিছুই একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত। সময় যতই সভ্যতার পথে হাঁটছে এই বোঝাপড়া ততই দৃঢ় হয়েছে। প্রকৃতিতে বিচ্ছিন্ন বলে কিছু নেই। অভিন্নসূত্রে গাঁথা সবকিছু। নদী-বৃক্ষ-পাখির সাথে মানুষের জীবনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষ। প্রকৃতির ওপর মানুষ বুদ্ধি দিয়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই বলে মানুষ এমন কোনো পথ বিনির্মাণ করতে পারেনি যে পথে প্রকৃতির সবকিছুর ওপর নির্ভরতা ছেড়ে দিয়ে বাঁচা যায়। ফলে মানুষ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী হলেও তার নির্ভরতা প্রকৃতির সব কিছুরই ওপর। নদী, বৃক্ষ এবং পাখি ছাড়াও পরিবেশের উন্নয়নে প্রকৃতিরই আরও অনেক বিষয় রয়েছে। এ লেখায় তিনটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

নদীর সাথে মানুষের জীবনের সম্পর্ক বিবিধ মাত্রার। অতীতে মানুষ নদীর পানি নিয়মিত পান করেছে। এখনো অনেকে নদীর পানি পান করে। আমাদের দেশে শুধু নয় বিশ্বব্যাপী সভ্যতার বিকাশে নদী অপরিসীম ভূমিকা রেখেছে। সভ্যতার সূচনালগ্নে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে নদীই ছিল একমাত্র অবলম্বন। ফলে প্রাচীন নগর গড়ে উঠেছিল নদীকেন্দ্রিক। বাংলাদেশে যত স্থানের নামের সাথে গঞ্জ আছে, খোঁজ নিলে জানা যায় তার সবগুলোই কোন না কোন নদীর পাড়েই গড়ে উঠেছে।

নদী আমাদের বৈচিত্র্যময় প্রাণের আধার ছিল। বিচিত্র প্রাণী বেঁচে ছিল নদীতে। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও দেশের অসংখ্য মাঝারি এবং বড় বড় নদীতে শুশুকসহ অনেক কিছুই ছিল। বর্তমানে কয়েকটি নদীতে এখন শুধু দেখা যায় শুশুক। মৌসুম আর নদীর আকৃতি ভেদে একেক নদীতে একেক ধরনের মাছ, পোকামাকড়ের বসতি। এখন নদীর বিচিত্র প্রজাতি লুপ্ত হয়েছে। আগামীতে অনেক প্রাণী বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে নদীর গুরত্ব কিংবা প্রয়োজনীয়তা এখনো অনেক। আমাদের দেশে যেসব নদী আছে এই নদীই সারাবছর ধরে নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। দেশের মোটামুটি সব জেলার সাথে নৌ যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী পঞ্চগড় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত নৌযোগাযোগ স্থাপন করার কথা বলেছেন। বাস্তবে এ কাজ করা খুব সহজ। আমাদের মুক্তিযদ্ধের সাথেও নদীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সৈয়দ শামসুল হক নদীকে গেরিলা যোদ্ধার সাথে তুলনা করেছেন। জালের মত ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশের নদীগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির আক্রমণ রোধে অনেকটা গেরিলার ভূমিকা পালন করেছে। কুড়িগ্রামে রৌমারী-রাজিবপুর দেশের সবচেয়ে বড় মুক্তাঞ্চল। এর নেপথ্যে নদীর ভূমিকা।

আমাদের দেশে জালের মত ছড়িয়ে আছে অগণিত নদী। আজ পর্যন্ত দেশের নদীর সংখ্যা চিহ্নিত করা যায়নি। সৈয়দ শামসুল হক তার কবিতায় অনেকবার তেরশত নদীর কথা উল্লেখ করেছেন। নদীর প্রকৃত সংখ্যা কারো কারো মতে এখনো দুই সহস্রাধিক। ছোট-বড়-মাঝারি অনেক নদী আজ বিলুপ্ত হয়েছে। এই বিলুপ্তর প্রধানতম কারণ মানুষ। একদিকে নদীর উপযুক্ত পরিচর্যার অভাব অন্যদিকে নদীর অবৈধ দখল-দূষণ।

আমাদের দেশ কৃষিনির্ভর। আমাদের সংস্কৃতি-সভ্যতা নদীপ্রভাবিত। আমাদের ভবিষ্যৎ নদীকে বাদ দিয়ে নয়। আমাদের ভূমি, আমাদের মন ও মনন গঠনের সাথে নদীর প্রভাব রয়েছে। বলা যায় আমাদের জীবনের পরতে পরতে নদীর প্রভাব জড়িয়ে আছে। এই নদী আজ বিপন্ন। এই নদীকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখার কোনো বিকল্প নেই।

২০১৫-২০১৬ সালে আমরা রিভারাইন পিপলের উদ্যোগে সারাদেশে জাতীয় রিভার অলিম্পিয়াড এর আয়োজন করেছিলাম। মূলত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নিয়েছিল। এই অলিম্পিয়াডে আমরা সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম তা হচ্ছে– ‘নদীর জন্য আমি কী করতে পারি?’

এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি নদী সুরক্ষায় ‘আমি’র গুরুত্বটাই সবচেয়ে বেশি। যে আদলে নদীর জন্য কাজ করা হোক না কেন সর্বত্রই কোন না কোন ব্যক্তিকেই ভূমিকা পালন করতে হয়। কিন্তু ব্যক্তি এককভাবে নদী রক্ষা করতে পারবে না। নদী রক্ষা করার কাজ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। তবে ব্যক্তির নির্দেশনা, পরবর্তী স্তরে ব্যক্তির উদ্যোগ নদী রক্ষায় একেকটি ভিত্তি। আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে নদী দখল হয়ে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নদীর পানি বাধাহীন করার ক্ষেত্রে যতবার অনুশাসন দিয়েছন এতবার অনুশাসন দিতে আর কোন প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশে কখনো দেখা যায়নি। প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা থাকার কারণেই প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ নেওয়া সহজ হচ্ছে। ফলস্বরূপ আমরা সারাদেশে নদী উদ্ধারের বিশাল কর্মযজ্ঞ লক্ষ করছি। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তিরও অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া দেশবাসীর কাছে দারুণ আশাজাগানিয়া। এখন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করে আমাদের দেশের নদীগুলো আজ হোক কাল হোক অবৈধ দখল মুক্ত হবে। ব্যক্তির ভূমিকা সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে। একজন শিক্ষার্থী নদী সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করবে। একজন শিক্ষক নদীপ্রেম শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগ্রত করবেন। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নদীবান্ধব পরিবেশনা প্রয়োজন আছে। রাজনীতিকগণকেও নদীর জন্য নিবেদিত হওয়া চাই। নদীর জন্য কাজ করা সবসময়ই সম্মানজনক

* শিক্ষক, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

কোথাও নদী দখল-দূষণ কিংবা নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন করতে দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানাতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব না হলে নদী রক্ষায় সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে। সমাজে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনও ভালো কাজ করতে হবে। সরকারের কাছে মাঠের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হবে। শুধু সরকারি চাকুরিজীবীদের দায়িত্ব নদী রক্ষা করা এমনটি ভাবলে ভুল হবে। আমাদের সবার যৌথ উদ্যোগে আমাদের নদীসমূহ রক্ষা পাবে। কখনো যৌথ চেষ্টা ব্যক্তিকে নদীর জন্য প্রস্তুত করবে কখনো ব্যক্তির তাড়না থেকেও যৌথ চেষ্টা দাঁড়াতে পারে। যেভাবেই হোক নদীকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা জারি রাখতে হবে।

বাংলাদেরে মাটি খুব উর্বর। এ মাটিতে গাছ রোপণ করা ছাড়াও পাখির ফল খেয়ে বীজ ফেললে সেখান থেকে কোন পরিচর্যা ছাড়া বৃক্ষ জন্ম নেয় এবং ফল দেয়। কোথাও নতুন মাটি কেটে ফেললেও কয়েকদিন পর সেখানে নানা রকম সবুজ গাছ-লতা-গুল্ম জন্মাতে দেখা যায়। আমাদের দেশের গ্রামগঞ্জে অনেক ঝাড়জঙ্গল ছিল। সেসব জঙ্গলে অসংখ্য বন্য প্রাণী ছিল। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে এবং সচেতনতার অভাবে আমারে বৃক্ষরাজি ধ্বংস হয়েছে। আমাদের দেশে পর্যাপ্ত বনভূমি নেই। অথচ আমাদের দেশে এখনো অনেক জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। সড়কের পাশে, বাড়ির উঠানে, সরকারি কার্যালয়ে, নদী-বিলের ধারে অনেক জায়গা পড়ে আছে। এসব জায়গায় বৃক্ষরোপণ করা সম্ভব।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশে অনেক সময় বৃক্ষরোপণ করা হয় লোক দেখানো। ফেসবুক সংস্কৃতি চাল হওয়ার পর বৃক্ষরোপণ ছবি তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। বৃক্ষরোপণ করার পর যে দুই থেকে তিন বছর পরিচর্যা করতে হয়, তাকে গরু-ছাগল, বন্যা, আগাছা থেকে রক্ষা করতে হয় এই বিবেচনাবোধের যথেষ্ট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বৃক্ষরোপণ করে সেগুলো বড় করে তোলা কঠিন কাজ। তবে অসম্ভব নয়। আমি নিজেই প্রায় অর্ধলক্ষ গাছ রোপণ করার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এর মধ্যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩৬ হাজার বৃক্ষ রোপণ করেছি। এই অভিজ্ঞতায় আমার পর্যবেক্ষণ হলো গাছের প্রতি ভালোবসা থাকলে এবং কিছুটা দায়িত্বশীল হলে বৃক্ষরোপণ-পরিচর্যা করা সম্ভব।

আমাদের দেশে দেশী ফলদ-বনজ-ওষধি অনেক কাজ আজ লুপ্ত হচ্ছে। এ প্রজাতিগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। সরকারিভাবে জেলায় জেলায় কিংবা উপজেলায় কয়েক একর জমি অধিগ্রহণ করে এলাকাভিত্তিক দেশের সব প্রজাতির অন্তত দুটি করে বৃক্ষ রোপণ করে রাখা প্রয়োজন। যাতে দেশ থেকে কোন প্রজাতির বৃক্ষ লুপ্ত হয়ে না যায়। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি-সংগঠন-সংস্থা (সরকারি-বেসরকারি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাখির নিরাপদ আবাসের ক্ষেত্রসমূহ কমে আসছে। এ পর্যন্ত দেশে ৭১৯ প্রজাতির পাখি দেখার রেকর্ড আছে। এর মধ্যে অকেগুলো গত ২০ বছর ধরে আর দেখাই যায় না। কোন প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়েছে। আমাদের নদীর পাখি কমে গেছে। কারণ নদী কমে গেছে। আমাদের জলাশয় কমে গেছে। ফলে জলাশয়ের পাখি কমে গেছে। আমাদের বনাঞ্চল লোপ পেয়েছে। ফলে বনের পাখি কমেছে। অনেক অসাধু পাখি শিকারী পাখি মেরেও পাখি কমিয়েছে। আমাদের দেশে আগের তুলনায় পাখিদের পরিযায়ন কমেছে। গোটা বিশ্বে পাখির সংখ্যা কমছে। তবে বাংলাদেশে কমছে আশঙ্কাজনক হারে। অনেক সভ্য মানুষ ফল কিংবা মাছ সুরক্ষার জন্য কারেন্টের জাল ব্যবহার করে। এতে প্রতি বছর প্রচুর পাখি মারা যায়। আমাদের দেশের বিল-জলাশয় বন্দোবস্ত দেওয়ার কারণে তারা এমনভাবে ওষুধ প্রয়োগ করে যে সেখানে আর পাখি আসেনা। আমি দীর্ঘদিন ধরে পাখি সুরক্ষায় কাজ করছি। আমি দেখেছি এখনো অনেকে পাশবিতকতার পরিচয় দিয়ে পাখি মেরে খায়। পাখির আবাস ও খাদ্যের কথা বিবেচনায় নিয়ে নদী-খাল-বিল-জলাশয়-বন সুরক্ষার কাজ করতে হবে।

নদী-বৃক্ষ-পাখি একটির সাথে আরেকটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অনাদিকাল থেকে ভূমিকা পালন করে আসছে। মানুষের জীবন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে এই প্রকৃতির প্রধান তিন অনুষঙ্গ অনন্তকালব্যাপী ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু সেজন্য মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। নদী-গাছ-পাখির সর্বনাশ করে বাঙালির পক্ষে সুস্থ-স্বাভাবিক যাপিত জীবন অসম্ভব। সেজন্য নিজ নিজ জীবন, উত্তর প্রজন্ম সর্বোপরি মানুষের কথা ভেবে হলেও নদী-বৃক্ষ-পাখি সুরক্ষায় সবারই এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার প্রস্তুতি এখন কালের দাবি। এই প্রস্তুতি একক দেশ হিসেবে কোন দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে অখণ্ড পৃথিবীর মানুষকে একটি সিদ্ধান্তে আসতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। অখণ্ড পৃথিবীর জন্য অভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদারতা ক্ষমতাধর দেশগুলো ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেনি। বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছেন জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ কাজের জন্য। জলবায়ুর অভিঘাত থেকে রক্ষা পেতেও নদী-বৃক্ষ-পাখি সুরক্ষার কাজ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের টেকসই জীবনের কথা ভাবলেও উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে অবহেলার কোন সুযোগ নেই। সঙ্গত কারণে এ বছর পরিবেশ দিবসের শ্লোগান– 'একটাই পৃথিবী' ও প্রতিপাদ্য 'প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমাদের নদী-বৃক্ষ-পাখির সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হলে পরিবেশের ওপর তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বেই।

পরিবেশ রক্ষায় নিবেদিত প্রাণঃ

আমার অন্তর্গত তাগিদ পরিবেশ নিয়ে। কর্মস্থলে পোড়া ইট বর্জনে সবাইকে নসিহত করেছি। এখন নিজের বাড়ি তৈরিতে পোড়ামাটির ইট ব্যবহার করলে নিজকে কেমন অপরাধী/প্রতারক বলে মনে হয়।

ব্লক দিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমাকে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যার অনেকগুলো বাস্তব, বাকিগুলো আমার নিজের অনভিজ্ঞতা প্রসূত।

হলো ব্লক ব্যবহারে প্রতিকুলতা এবং তার উত্তরণ

১. মানসম্মত ব্লকের প্রাপ্যতা-

ব্লক তৈরির কয়েকটি পুরনো এবং নামী প্রতিষ্ঠানসহ ছোট এবং মাঝারি অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সবার কাছেই ব্লকের মান নির্ধারণ বিষয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সার্টিফিকেট রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো ব্লকের দৃঢ়তা (পিসিও) নিয়ে। প্রস্তুতকারী যে নমুনা সার্টিফিকেট দেখাবে তার সাথে বর্তমানে সরবরাহকৃত ব্লকের মিল নাও হতে পারে। সাধারণ ইটের রং দেখেই মান বোঝা যায়, ব্লকের ক্ষেত্রে এটি সম্ভব নয়। ব্লকের মান যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতা। ব্লক দিয়ে কাজ করলেই নির্ধারিত ব্লকের গুণাগুন যাচাই করা সম্ভব।

২. উপযুক্ত রাজমিস্ত্রির অভাব-

ব্লক ব্যবহারে দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা হলো অভিজ্ঞ রাজমিস্ত্রি না পাওয়া। সাধারণ রাজমিস্ত্রিগণ ব্লকের কাজে অনভ্যস্ততার কারণে, নতুন কাজে সময় বেশি লাগার অজুহাত দেখিয়ে বাড়তি মজুরি দাবি করে বসে। এ ধরনের কাজ নতুন বিধায় অধিকাংশ রাজমিস্ত্রি এটিকে ঝামেলাপূর্ণ মনে করে। কিছুটা প্রশিক্ষণ না দিয়ে তাদেরকে দিয়ে কাজ করানোটাও সম্ভব নয়।

পুরনো কোনো মিস্ত্রি যাদের দেশ বা বিদেশে কাজের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের কাউকে খুঁজে বের করে কাজ শুরু করা যেতে পারে। একাজে একজন অভিজ্ঞ মিস্ত্রি পাওয়া গেলে বাকীরা তার কাজ দেখেই পুরো বিষয়টি শিখে নিতে পারবেন।

৩. সলিড ব্লকের সীমাবদ্ধতা-

ব্লকের তৈরি ভবনে কিছু সলিড ব্লকও ব্যবহার হয়ে থাকে। এসব সলিড ব্লক আকারে সাধারণ ইটের মতো হলেও মসৃনতা বেশি থাকায় সিমেন্টের বাঁধন তুলনায় দুর্বল হয়। ফলে মেঝের সলিং, লে আউট, পাইল ক্যাপ স্তরে সলিড ব্লকের ব্যবহার ততটা সুবিধাজনক নয়। এসব স্থানে ব্যবহারের জন্য আরো জুতসই ব্লক প্রয়োজন। দেয়ালের সর্বনিম্ন স্তরে (লে আউট) সলিড ব্লকের পরিবর্তে 'হলো ব্লক' ব্যবহার করে ব্লকের ফাঁকা অংশগুলো প্রয়োজনমতো সিমেন্ট ও ক্ষুদ্র ইট বা পাথরের টুকরা দিয়ে ভরে দেওয়া যেতে পারে। দেয়াল আরো মজবুত করার জন্য দেয়ালের অভ্যন্তরে ৪/৫ ফুট অন্তর অন্তর একটি করে ১০ কিংবা ১২ মি.মি. ব্যাসের রড স্থাপন করা যেতে পারে। সে সাথে রডের পার্শ্বস্থিত ব্লকের ফাঁকা অংশে একটু করে সিমেন্ট- ইট বা পাথরের টুকরা মিশিয়ে দিলে রড বরাবর দেয়ালের এ অংশগুলো কলামের মতো মজবুত হয়ে যায়।

৪. দেয়ালের প্লাস্টারে ফাঁটল বা ক্র্যাক-

নির্মাণাধীন ভবনে প্লাস্টার করার পর ফাটল বা ক্র্যাক দেখা দিতে পারে। এটি অপ্রত্যাশিত হলেও বিরল নয়। হলো ব্লকের দেয়াল কেটে বৈদ্যুতিক তার কিংবা সেনিটারি পাইপ বসানোর জায়গাগুলোতে এসব ফাটল বেশি হবে পারে। এটা কমানোর জন্য বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তবে, সতর্কতা সত্ত্বেও দেয়ালের প্লাস্টারে কিছু ফাটল ক্র্যাক থাকবে, এটি প্রায় অবধারিত। তবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ফাটল দূরীকরণে ইউটিউবে অনেক পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায়। সবচে কার্যকর হলো ফাটলগুলোর উপরিভাগ গ্রাইন্ডিং মেশিনে কেটে সামান্য বড় করে ('ঠ' আকৃতিতে) এতে 'ক্র্যাকসিল' লাগিয়ে তার উপরিভাগে সুক্ষ তারের জালি কিংবা ফাইবার গাসের জালি ব্যবহার করে প্লাস্টার করে নিলে এ সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

৫. হলো ব্লকের দেয়াল ফুটো করায় ঝামেলা-হলো ব্লকের ভবনের দেয়ালে যথেচ্ছ ফুটো করে মশারী, ছবি, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি টানানো অসুবিধাজনক। এতে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যাবেনা, উপরন্তু দেয়ালের প্লাস্টার এবং রঙ মেরামতে বেশ ঝামলা পোহাতে হবে। দেয়ালে মশারী, ছবি, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি টানানোর জন্য আঠাযুক্ত আলাদা হুক ব্যবহার করতে হবে। নানা আকৃতির এসব হুক অনলাইনে সহজেই পাওয়া যায়। আরএফএলের 'বেস্ট বাই' দোকানে এসব হুক বেশ সহজলভ্য।

'পোড়া ইট' বনাম 'হলো ব্লক'- ঝঞ্জাট বনাম প্রাপ্তি

হলো ব্লক দিয়ে বাড়ি তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত বর্ণিত ধরনের ঝামেলাগুলো এড়ানো খুব সহজ নয়। কাজেই ইটের পরিবর্তে ব্লক দিয়ে বাড়িনির্মাণের সুফলগুলো প্রত্যেক নির্মাতারই ভালভাবে জানা আবশ্যক। জানা প্রয়োজন এসব ঝামেলা শেষে আসল প্রাপ্তিটাই বা কি? উত্তরে বলা যায় ব্লকের বাড়ি নির্মাণে যেসব ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয় সে তুলনায় প্রাপ্তিও নেহাত কম নয়। বরং বলা যায় অনেক বেশি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

বাড়ি নির্মাণের পূর্বে আমার কাছে এটি অনেকটা তাত্ত্বিক বলে মনে হলেও গত শীতে এবং চলমান গরমে (নভেম্বর - ২০২১ থেকে মে-২০২২) এ ব্লকের বাড়িতে বসবাস করে নিশ্চিত হয়েছি যে এসব শুধু তত্ত্বকথা নয়। 'হলো ব্লকে' নির্মিত ভবনের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত অনুকূলে থাকে। শব্দের বেলাতেও এটি প্রযোজ্য। বাইরের কোন গোলযোগ ভিতর থেকে বেশ কমই শুনতে পাওয়া যায়।

ব্লকে বাড়ি নির্মাণ কি অর্থ সাশ্রয়ী?

পোড়ামাটির তুলনায় ব্লক ইটে বাড়ি নির্মাণ হিসেবমতে কিছুটা সাশ্রয়ী। কিন্ত বর্তমান প্রেক্ষাপটে যখন ব্লকের ব্যবহার খুবই সীমিত, তখন ব্লকের ব্যবহার করতে যেয়ে নানা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। নতুন ধরণের কাজ বলে ঠিকাদারগণ বেশি মজুরী দাবি করে বসে। দাবিটি অযৌক্তিক হলেও এসব নিষ্পতি না করে কাজে এগুনো সম্ভব হয়না। ফলে অর্থ সাশ্রয়ের সুবিধার কথা আপাতত বাদ দিয়েই এগুতে হবে।

শেষ কথা

পোড়া ইট বর্জন করে ব্লক ব্যবহার করতে যেয়ে আমাকে নিত্য নতুন নানা সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে। তবে এসব সমস্যা মোকাবেলা করেও শেষ পর্যন্ত 'সাত তলা' (বেসমেন্ট ও পার্কিং ব্যতিত) একটি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি।

চারদিকে নানা কর্মকান্ডে আমাদের পরিবেশ প্রতিনিয়ত দূষিত হয়ে চলেছে। আমিও একজন দূষণকারী কিংবা নিরুপায় দর্শক। পরিবেশের ক্ষতিরোধে বৃহৎ কোন উদ্যোগ নেয়ারও সামর্থ্য আমার নেই। তথাপি মাটির প্রদীপের মতো "আমার যেটুকু সাধ্য" তাই আমি করা চেষ্টা করেছি- এটিই আমার সান্তনা!

আমি বাংলার গান গাই

মুকিত মজুমদার বাবু*

বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। অনেকটা পথ চলে এসেছি আমরা। এই পঞ্চাশে অনেক প্রাপ্তি আছে। পঞ্চাশের অনেক হতাশাও আছে। ফেলে আসা পঞ্চাশের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে নেব আগামী পঞ্চাশে। শপথ নিতে হবে– একশো বছরের বাংলাদেশ হবে প্রকৃত অর্থেই নদীমাতৃক বাংলা, সবুজে সাজানো সোনার বাংলা। আমরা রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা গড়ব। নজরুলের মুগ্ধতার বাংলা গড়ব। জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা গড়ব। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ব।

হাওর

গ্রামীণ প্রকৃতি

আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য স্থির। এবার জোর পায়ে এগোতে হবে। পথের জঞ্জাল উপড়ে ফেলতে হবে। পায়ে দলে যেতে হবে পথের বাঁধা-বিঘ্ন। বিবর্ণকে বর্ণ ফিরিয়ে দিতে হবে। মরা ডালে ফুল ফোটাতে হবে। বন উজাড় রোধ করতে হবে। তলানিতে জমে থাকা জলাশয় টইটম্বুর করে তুলতে হবে। মরা নদীকে ফিরিয়ে দিতে হবে থৈ থৈ জলের ধারা। পাখিরা উড়বে নির্ভয়ে। বন্যপ্রাণী বনে বিচরণ করবে আপনমনে। মানুষের ভেতরের অসচেতনতাকে দূরে ঠেলে জ্বালাতে হবে সচেতনতার আলো। বোবাকে শেখাতে হবে কথা। ঘুমিয়ে থাকা মানুষকে জাগাতে হবে। প্রকৃতির ভালো-মন্দ নিয়ে অবশ্যই মানুষকে ভাবতে হবে। ভাবতে বাধ্য করতে হবে। প্রাণ-প্রকৃতি সংরক্ষণ করতে হবে ক্ষমতার সঙ্গে মমতা মিলিয়ে। মনে রাখতে হবে প্রাণ কখনো প্রকৃতি ছাড়া বাঁচে না।

*চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন

একটাই কথা– সবুজে সাজাতে হবে বাংলাদেশ। কী ছিল তা নিয়ে আর আক্ষেপ নয়। যা আছে তাই-ই এখন সংরক্ষণ করতে হবে। আজ–এখন থেকেই এগোতে হবে সামনের দিকে। প্রকৃতি ধ্বংসের রাশ টেনে ধরতে হবে। সময়ক্ষেপণ অনেক হয়েছে। এখন অঙ্কুরিত বীজের সুরক্ষা দিতে হবে। পরিচর্যা করতে হবে যতক্ষণ না মহীরুহে রূপ না নেয়। ঘর থেকে ঘরে, গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে ছড়িয়ে দিতে হবে প্রকৃতি সংরক্ষণের শিক্ষা। আজ যারা শিশু, আগামী দিনে তারা দেশের ভবিষ্যৎ। তারাই দেশের ভালো-মন্দ দেখভাল করবে। আজ তাদের মনে স্থায়ী করতে হবে প্রকৃতি সংরক্ষণের শিক্ষা। আর এ শিক্ষা ছড়িয়ে দেব আমরা। সভ্যতার সঙ্গে তাল মেলাতে হবে। প্রকৃতি সংরক্ষণ করতে হবে। সেইসঙ্গে প্রকৃতিবান্ধব গ্রাম-শহর গড়ে তুলতে হবে।

জাফলং

রাতারগুল

আমরা স্বপ্ন আঁকি। সবুজে নিকানো স্বপ্ন। উচ্ছ্বাসের স্বপ্ন। আনন্দের স্বপ্ন। রোপণ করি স্বপ্নের বীজ মানুষ থেকে মানুষে। মন থেকে মনে। গ্রাম থেকে গ্রামে। শহর থেকে শহরে। দেশ থেকে দেশে। আমরা সাজানো দেশের প্রত্যাশায় ছুটছি নিরন্তর। যে দেশটি হবে রঙতুলিতে আঁকা ঠিক ছবির মতো সুন্দর। গলাভরা জলের নদীতে ঝাকা ভর্তি মাছ ধরবে সুকুমার। ভবেশ মাঝি রঙিন পাল উড়িয়ে নাও নিয়ে ভাটিয়ালি গান ধরবে। আকবর মিয়া লাঙল নিয়ে স্বপ্ন চাষ করবে উর্বরা জমিনে। ছায়ার মায়ায় শীতল করবে প্রাণ।

প্রাণ-প্রকৃতিতে ক্ষয় ধরলেও বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ। এ দেশে অহঙ্কার করার মতো অনেক কিছু আছে। এ দেশে আছে– পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। নীল জলরাশির টেউগুলো ছুঁয়ে যায় অন্তর। বিশাল তটরেখা, আকাশ আর সাগর মিলন মুগ্ধতা আনে। ঢেউয়ের তালে তালে নৌকার দুলুনি, চুল এলোমেলো করা বাতাস, সাগরের গর্জন, ঝাউবনের শনশন... সব মিলিয়ে কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকত যেন এক অচিনপুর।

আমাদের আছে– বনসুন্দরী সুন্দরবন। সুন্দরী, গেওয়া, গড়ান, পশুর, বাইন, হেঁতাল, গোলপাতা গাছের ফাঁকে দেখা মেলে ডোরাকাটা বেঙ্গল টাইগারের। আছে চঞ্চলা হরিণ, কুমির, সাপ, ব্যাঙ, ভোঁদড়, পাখপাখালি কী নেই সুন্দরবনে!

সুন্দরবন

সেন্টমার্টিন

সৌন্দর্যের আধার প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিন। মেঘমুক্ত দিনে জলের ওপর থেকে নিচে তাকালে দেখা যায় প্রবালের মজার জগৎ। ছোট-বড়, মেরুদণ্ডী-অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও উদ্ভিদকে আগলে রেখেছে প্রবাল। প্রবাল প্রাচীরের গা বেয়ে উঠেছে নানা জাতের সামুদ্রিক শৈবাল। সেন্টমার্টিনের সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় সবাইকে মুগ্ধ করে।

বাংলার আরেক বিস্ময় কুয়াকাটা। এখানে আছে মুগ্ধতা ছড়ানো সমুদ্রসৈকত। সাগরের কোলজুড়ে সুন্দরের হাতছানি কুয়াকাটা আজ সাগরকন্যা নামে পরিচিত। চোখ জুড়ানো, মন ভোলানো এই সুন্দর আমাদের গর্ব, আমাদের অহঙ্কার।

জলসহিষ্ণু গাছ নিয়ে রাতারগুল জলার বন। কেউ কেউ 'সিলেটের সুন্দরবন'ও বলে থাকেন।

অপরূপ রূপের সাজেক ভ্যালি। সাজেককে বলা হয় 'রাঙ্গামাটির সবুজ ছাদ'। সাজেকের সারি সারি আকাশ ছোঁয়া পাহাড়। মাথার উপর পাখির মতো ওড়া মেঘ হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় আবার মিলিয়ে যায় চোখের পলকে। অবাক করা কাণ্ড হলো– এখানে একই দিনে প্রকৃতির তিন রূপের দেখা পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা, গরম আর বৃষ্টির। আসলে সাজেক ভ্যালি রূপকথার এক স্বপ্নপুরী।

বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশিতে নিঝুম দ্বীপ একখণ্ড উজ্জ্বল সবুজের বাগান। দিনে দুবার জোয়ার-ভাটা খেলে যাওয়া নিঝুম দ্বীপের

একপাশ ঢাকা বালিতে, অন্যপাশে সৈকত। দ্বীপের বেশিরভাগ জায়গাজুড়ে ঘাসের সবুজ গালিচা। সেখানে হরিণের দল ছোটাছুটি করে। চড়ে বেড়ায় মহিষ। নিঝুম দ্বীপকে অনেকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন বলে থাকেন।

ধলাই আর পিয়াইন নদীর স্বচ্ছ জলরাশি কলকল মধুর শব্দ নূপুরের মতো দোলা দিয়ে যায়। ঝুলন্ত ডাউকি ব্রিজ থেকে যে দিকে তাকানো যায়– আহ কি অপূর্ব দৃশ্য! এছাড়া সমতল ভূমির গাঢ় সবুজ পরিপাটি চা বাগান, খাসিয়া পল্লী, পানের বরজ, পাহাড়ের গায়ে গহিন বন, প্রকৃতির সুনসান নীরবতা আর বাহারি নুড়িপাথরের এক মোহনীয় জায়গা হলো জাফলং। জাফলংয়ের আরেক নাম 'প্রকৃতি কন্যা'।

সমুদ্র

সমুদ্র

নীলগিরি থেকে আকাশের নীল রঙটা খুব বেশি স্পষ্ট দেখায়। যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই নীলের ছড়াছড়ি। তাই জায়গাটার নাম হয়েছে নীলগিরি। চারপাশে ছোট-বড় অনেক পাহাড়। পাহাড়ে দাঁড়িয়ে ছুঁয়ে দেখা যায় মেঘ। সারা শরীরে মেখে নেওয়া যায় মেঘের মোলায়েম পরশ। নীলগিরি থেকে পাহাড়ি রাস্তাগুলো সাপের মতো দেখায়। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের অপূর্ব দৃশ্য যেকেউকে মুগ্ধ করবে।

কুয়াশার মতো মেঘে ঢাকা নীলাচল সৌন্দর্যের আরেক লীলাভূমি। যেদিকে তাকানো যায় শুধু সবুজ আর সবুজ, আকাশে হেলান দেওয়া উঁচু-নিচু পাহাড়, আপন খেয়ালে মেঘের ভেসে চলা, ঝিরিঝিরি বাতাসের মিষ্টি ছোঁয়া... সব মিলিয়ে নীলাচল অতুলনীয়!

জীববৈচিত্র্যের কারণে বাইক্কা বিলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনে রাখার মতো। বিলটিকে পাখির রাজ্য বললে অত্যুক্তি হয় না। জলের ওপর চোখ জুড়ানো শাপলা-পদ্ম-পানায় সাজানো বিলটির ভেতর দিয়ে নৌকা দিয়ে যেতে যেতে মনে হবে এ এক স্বপ্নের দেশ!

বাংলাদেশের জলাশয়ের মধ্যে অন্যতম হলো হাওর। মিঠা জলের এ হাওর হচ্ছে গামলা বা বেসিন আকৃতির যেখানে পাহাড়ি নদী থেকে বয়ে আসা জল জমা হয়। বড় বড় হাওরগুলো বর্ষা মৌসুমে জলে ভেসে যায়। তখন একাধিক হাওর মিলেমিশে বিশালাকার জলাশয়ের সৃষ্টি করে। হাওরকে তখন সমুদ্র মনে হয়।

বাংলার ষড়ঋতুর রাতদিনগুলোরও আলাদা রূপ। শীতের সকাল দেখতে একরকম তো বসন্তের সকাল অন্যরকম। শরতে জোসনার হাসিতে দেশ স্নান করে আবার আষাঢ়ের মেঘে ঢাকা দিনরাতে দেশ বৃষ্টিতে স্নান করে। কোনো ঋতুতে গাছের পাতা ঝরে আবার কোনো

ঋতুতে গাছে পাতা গজায়। বাংলার দিনের রঙেও আছে সৌন্দর্য। সকাল একরকম, দুপুর একরকম, সন্ধ্যা আবার অন্যরূপে ধরা দেয়। রাতের অন্ধকারেরও রয়েছে সীমাহীন ভালোলাগা। এমন বৈচিত্র্যময় দেশের রূপে মুগ্ধ হয়েই কবি বলেছেন–

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি...'

বাইক্কাবিল

পাহাড়

বাংলার রঙবাহারি রূপ ধরে রাখতে হবে। রঙচটা জায়গাগুলোতে দিতে হবে নতুন রঙের প্রলেপ। তাই আজই, এখনই আমাদের উদ্যোগী হতে হবে প্রকৃতিবান্ধব দেশ গড়ার কাজে। বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। অনেকটা পথ চলে এসেছি আমরা। এই পঞ্চাশে অনেক প্রাপ্তি আছে। পঞ্চাশের অনেক হতাশাও আছে। ফেলে আসা পঞ্চাশের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে নেব আগামী পঞ্চাশে। শপথ নিতে হবে– একশো বছরের বাংলাদেশ হবে প্রকৃত অর্থেই নদীমাতৃক বাংলা, সবুজে সাজানো সোনার বাংলা।

আমরা রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা গড়ব।
নজরুলের মুগ্ধতার বাংলা গড়ব।
জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা গড়ব।
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ব।

প্রেক্ষিত বায়ুদূষণ: আমাদের করণীয়

সৈয়দ নজমুল আহসান*
ড. মোহাম্মাদ আব্দুল মোতালিব**

প্রেক্ষাপট এবং বায়দূষণের উৎস ও কারণ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে নগরায়ন ও শিল্পায়নের হার বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অনুষঙ্গ হিসাবে পরিবেশ দূষণ বিশেষ করে বায়ুদূষণের মাত্রাও বেড়েছে অনেক। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বায়ুদূষণ প্রকট আকার ধারণ করছে। ফলে প্রতিটি প্রাণীর বেঁচে থাকার অপরিহার্য উপাদান নির্মল বায়ু নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকাসহ বড় বড় শহরে অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট ধূলাবালি ও ভাসমান ধূলাবালি বা বস্তুকণা (Particulate Matter-PM), ইটভাটা সৃষ্ট দূষণ, যানবাহন থেকে সৃষ্ট কালো ধোঁয়া, পৌর বর্জ্য পোড়ানো ইত্যাদি বায়ুদূষণের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত। অধিকন্তু', ক্ষতিগ্রস্ত বা ভাঙ্গা রাস্তা এবং অনাবৃত স্থানের কাদা মাটি থেকে প্রচুর ধূলাবালি সৃষ্টি হয়। বংলাদেশ ভৌগলিকভাবে পলিমাটি দ্বারা গঠিত একটি বদ্বীপ। ঢাকা বা ঢাকার বাইরে ভূপৃষ্ঠের পলিমাটি (অনাবৃত বা উন্মুক্ত স্থানে) যানবাহন চলাচল বা প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট কারণে অতিসহজেই ডাস্ট আকারে ছড়িয়ে পড়ে বায়ুদূষণ সৃষ্টি করে।

এছাড়া আন্তঃসীমান্ত (transboundary) বায়ুদূষণ দেশের বায়ুদূষণের মাত্রাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণা তথ্যমতে বাংলাদেশের ২০-৪০% বায়ুদূষণ আন্তঃসীমান্ত (transboundary) দূষণ তথা সেকেন্ডারি দূষণ সৃষ্টির মাধ্যমে বায়দূষণের মাত্রাকে বৃদ্ধি করছে। উক্ত গবেষণা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের বায়ুদূষণের অভ্যন্তরীণ উৎসের পাশাপাশি বহিঃ উৎস অনেকাংশে দায়ী।

সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, শুষ্ক মৌসুমে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বায়ু দূষণের মাত্রা অত্যাধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে-যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিশেষ করে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে স্বল্প বৃষ্টিপাত, শুষ্ক আবহাওয়া ও নির্মাণকাজ বৃদ্ধির কারণে স্বাভাবিকভাবে বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি ঢাকার বায়ুর মান (Air Quality Index-AQI) অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর (Extremely Unhealthy) রয়েছে, যার ফলে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর সারাদেশে ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (CAMS) ও ১৫টি কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশনের (C-CAMS) মাধ্যমে বায়ুমান পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

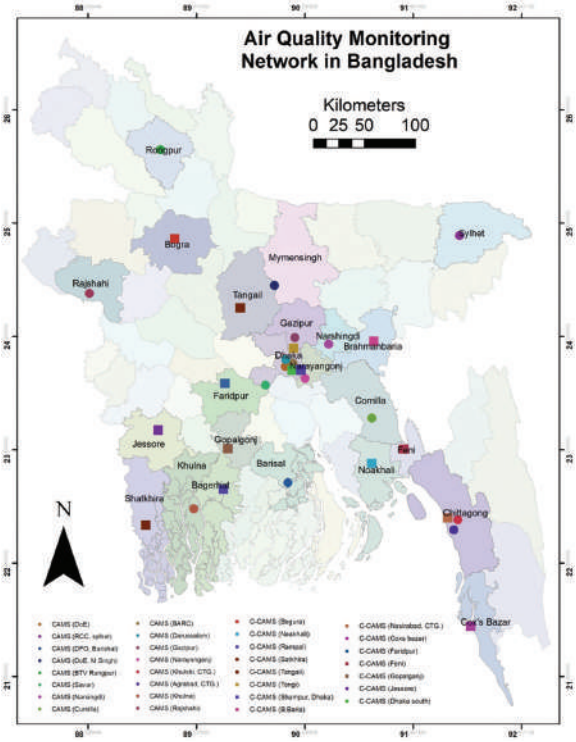

ক্যামসের স্যাম্পলিং প্রব

*পরিচালক, বায়ুমান ব্যবস্থাপনা শাখা, **উপপরিচালক, বায়ুমান ব্যবস্থাপনা শাখা, পরিবেশ অধিদপ্তর

ক্যামস (CAMS) ও সি-ক্যামস (C-CAMS) সমূহের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে বায়ুতে বিদ্যমান পিএম১০ (Particulate Matter10), পিএম২.৫ (Particulate Matter2.5), ওজোন (O_3) সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2), নাইট্রোজেনের অক্সাইডস (NO_x) ও কার্বন মনোক্সইড (CO) এই ০৬ ছয়টি বায়ুদূষক পরিবীক্ষণ করা হয়। বায়ুমান পরিবীক্ষণের প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করে দৈনিক ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক (Air Quality Index-AQI) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।

নিম্নে ২০১৯ হতে ২০২১ সালের ঢাকা শহরের PM২.৫ এর মান উপস্থাপন করা হলো:

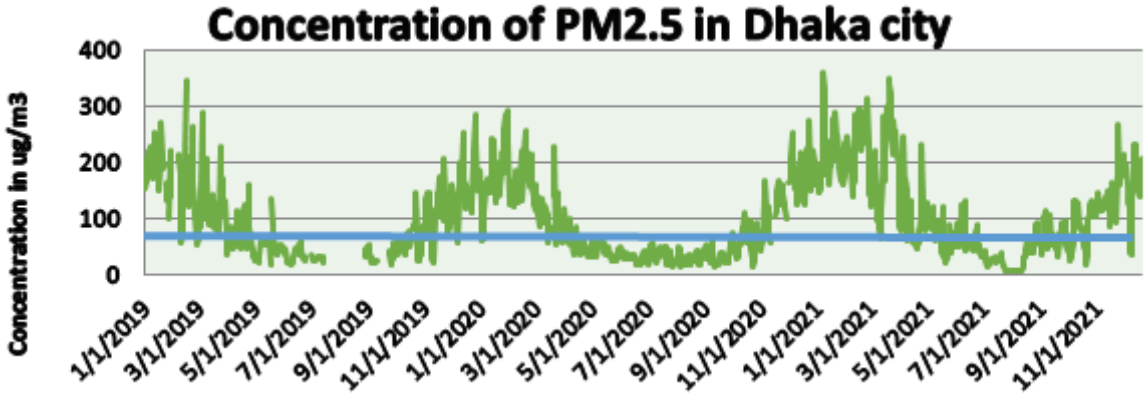

ঢাকাসহ অন্যান্য স্টেশনের বায়ুর গুণগত মান পরিমাপকৃত ডাটাসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায়, আবহাওয়াগত কারণে বিভিন্ন মৌসুমে বায়ুদূষণের মাত্রায় অনেক তারতম্য ঘটে। শুষ্ক মৌসুমে উত্তর পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত দূষণযুক্ত বাতাস দেশে প্রবেশ করে যার ফলে দেশে বৃষ্টিপাত কম হয়। এছাড়াও এসময় আবহাওয়াগত কারণে ঢাকা ও আশেপাশে বায়ুপ্রবাহের গতি কম থাকে। এ সময় স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট ও বহিঃ বাংলাদেশ হতে আগত দূষিত বায়ুর মাধ্যমে ঢাকার উপর সৃষ্ট Degraded Airshed দীর্ঘদিন অবস্থান করে বা Stagnant থাকে। এ কারণে দেশের বড় বড় শহরগুলোতে এ সময় বায়ুদূষণের (বস্তুকণা- particulate matter-PM) মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং পারিপার্শ্বিক বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করে। যা কোনো কোনো সময় নির্ধারিত মানমাত্রার দ্বিগুণ হয়ে যায়। বর্ষাকালে দেশের বায়ু প্রবাহ দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর হতে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এসময় পার্শ্ববর্তী কোনো দেশের বাতাস দেশে প্রবেশ করে না এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটায়, যার ফলে দেশের বায়ুর গুণগত মান স্বাস্থ্যকর থাকে। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় (বর্ষা মৌসুমে) বায়ু গুণগত মান ভালো অর্থাৎ নির্ধারিত মানমাত্রার গড় বায়ুর PM2.5 এবং PM10 এর মানমাত্রা যথাক্রমে ৬৫ µg/m3 এবং ১৫০ µg/m3) মধ্যে থাকে। উল্লেখ্য, সারা বছর অন্যান্য বায়ু দূষকসমূহ যেমন; SO_2, CO, NOx, এবং O_3 নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যেই থাকে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশনের মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তুকণা (Particulate matter-PM) PM2.5 এবং PM10, SO_2, CO, NOx এবং O_3 সহ আবহাওয়াগত উপাত্তসমূহ নিয়মিত পরিমাপ করা হয়। এসকল উপাত্ত বিশ্লেষণ করে Air Quality Index (AQI) এ রূপান্তর করে তা পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

Air Quality Index (AQI) এর ক্যাটাগরিসমূহ নিম্নরূপ পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়:

Air Quality Index (AQI) for Bangladesh			
Air Quality Index (AQI)	Category		Colour
	In English	In Bangla	
0-50	Good	ভালো	Green
51-100	Moderate	মোটামুটি	Yellow Green
101-150	Caution	সতর্কতামূলক	Yellow
151-200	Unhealthy	মোটামুটি অস্বাস্থ্যকর	Orange
201-300	Very unhealthy	খুব অস্বাস্থ্যকর	Red
301-500	Extremely unhealthy	অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর	Purple

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশনের মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তুকণা (Particulate matter-PM) PM2.5 এবং PM10, SO_2, CO, NOx এবং O_3 উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় সাধারণত PM2.5 প্যারামিটারটি সব সময় AQI হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে।

জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০ পর্যন্ত ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের বায়র গুণগতমানের Air Quality Index (AQI) নিম্নে গ্রাফ আকারে উপস্থাপন করা হলো:

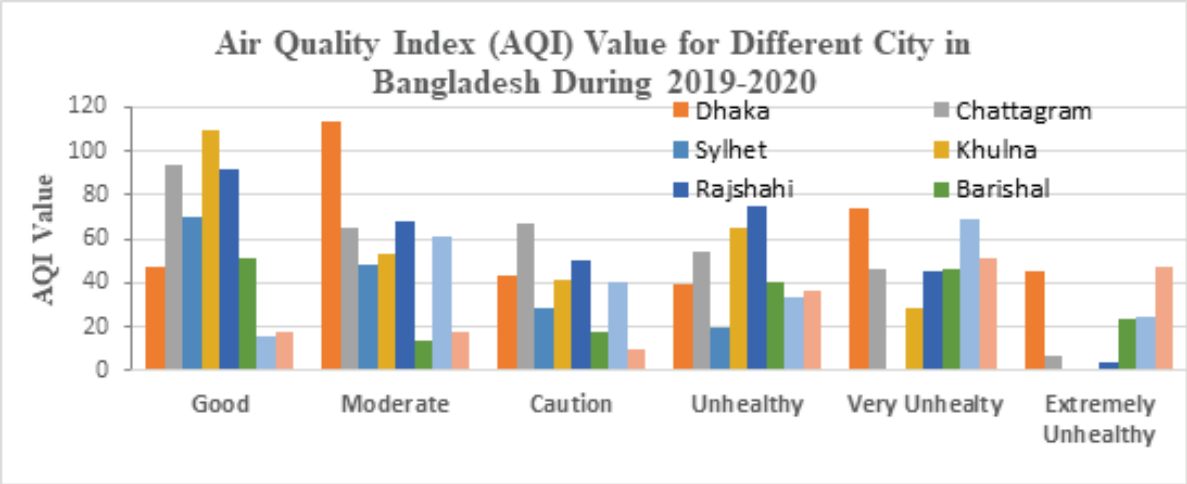

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরের জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ের AQI বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সময়ে AQI এর অবস্থা ভালো (Good) ও মোটামোটি (Moderate) এর মধ্যে বেশি রয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তখন বায়ুমানের অবস্থা অন্যান্য বছরের তুলনায় আনেক ভালো ছিল। (কারণ, সেসময় করোনা ভাইরাসের কাভিড-১৯) নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ ছুটিকালীন (lockdown) বায়ুদূষণের উৎসসমূহ বন্ধ থাকায় এমন অবস্থা পাওয়া গিয়েছে। তবে ঐ সময়ে অন্যান্য শহরের তুলনায় রংপুর শহরের AQI তুলনামূলকভাবে বেশি অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর (Unhealthy) ও খুব অস্বাস্থ্যকর Very Unhealthy) ছিল যা Indo-Gangetic Plain এর আন্তঃসীমান্ত (transboundary) দূষণকে প্রমাণিত করে। দেশের এ সকল বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে সিলেট ও বরিশালের বায়ুমানমাত্রা অন্যান্য শহরের তুলনায় অনেক ভালো ছিল।

দেশের বিভাগীয় শহরের জুলাই ২০২০-জুন ২০২১ বায়ুর গুণগতমানের এর AQI নিম্নে গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

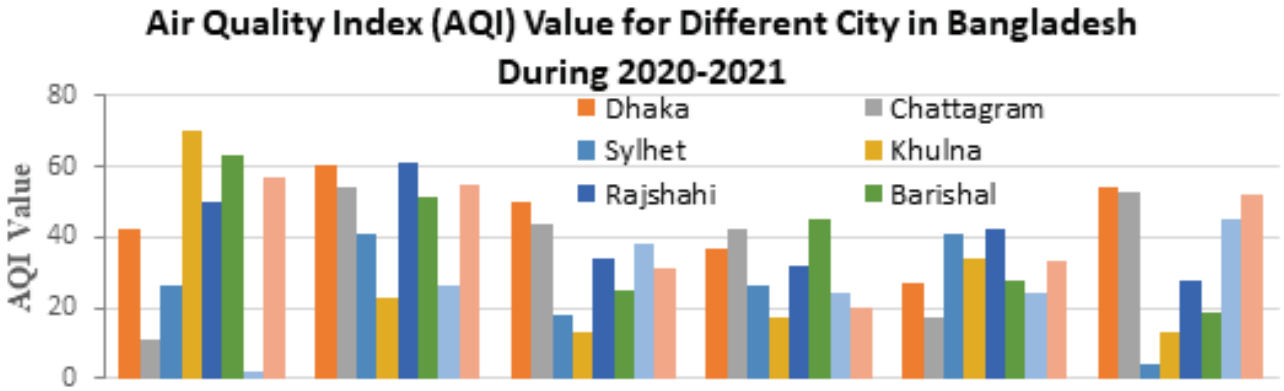

জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ের AQI বিশ্লেষণে দেখা যায় খুলনা ও বরিশালের AQI অবস্থা অন্যান্য শহরের তুলনায় ভালো (Good) অবস্থানে রয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও রংপুরের AQI মোটামুটি (Moderate) অবস্থা বেশির রয়েছে এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশালে অস্বাস্থ্যকর (Unhealthy) বেশি পাওয়া যায়। এসময় সিলেট, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরের অছও অন্যান্য শহরের তুলনায় খুব অস্বাস্থ্যকর (Very Unhealthy) অবস্থা বেশি ছিল। অপরদিকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও রংপুরের AQI অন্যান্য শহরের তুলনায় অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর (Extremely Unhealthy) অবস্থা বেশি ছিল। জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ের AQI বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, দেশের বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও রংপুরের বায়ুর গুণগত মান অন্যান্য শহরের তুলনায় বেশি থাকে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার বায়ুদূষণের প্রধান উৎসসমূহ চিহ্নিত করে সে উৎসসমূহের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর অংশ হিসাবে সরকার বায়ুদূষণ হ্রাস এবং কৃষি মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) কার্যকর করেছে। ইতোমধ্যে ঢাকাসহ আশেপাশের পাঁচটি জেলার সকল অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে এবং সারাদেশে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সরকারি নির্মাণকাজে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সরকার পোড়ানো ইটের পরিবর্তে ১০০% ব্লক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ ও নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের মাধ্যমে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (এসআরও) জারি করা হয়েছে এবং মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে উক্ত প্রজ্ঞাপণ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে যানবাহনের কালো ধোঁয়া, অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ কার্যক্রম ও নির্মাণ সামগ্রী পরিবহন, অবৈধ টায়ার পাইরোলাইসিস এবং লেড এসিড ব্যাটারি রিসাইক্লিং কারখানা, স্টোন ক্রাশার ইত্যাদি বায়ুদূষকারী অবৈধ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দণ্ড	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
			অর্থ দণ্ড (টাকা)		
১। যানবাহনের কালো ধোঁয়া	৪১	২৬২	৮,২৮,৪০০/-	৮,২৮,৪০০/-	
২। ইটভাটা	৪৪৫	৬৮৭	১৬,৭৬,৫৪,০০০/-	১৪,৭৬,৫৪,০০০/-	পরিবেশ দূষণকারী ৩৪০টি ইটভাটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে
৩। স্টোন ক্রাশার	১	৩	৮৫,৬০,০০০/-	৮৫,৬০,০০০/-	
৪। অতিরিক্ত দূষক	১৬৯	১৯৩	১,৩৪,০০,২০৮/-	১,৩৪,০০,২০৮/-	
৫। নির্মাণ সামগ্রীর বায়ুদূষণ	৬	২১	৩,৭১,০০০/-	৩,৭১,০০০/-	

জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দণ্ড অর্থ দণ্ড (টাকা)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১। যানবাহনের কালো ধোঁয়া	৩৪	২৬৩	৬,৮৩,২০০/-	৬,৮৩,২০০/-	
২। ইটভাটা	৩৯৩	৭১৯	২১,৭৫,৬১,০০০/-	২১,৭৫,৬১,০০০/-	পরিবেশ দূষণকারী ৩১৯টি ইটভাটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে
৩। স্টোন ক্রাশার	৪	১০	৮,২৫,০০০/-	৮,২৫,০০০/-	
৪। অতিরিক্ত দূষক	৭৯	১৪২	৪২,০৩,৩০০/-	৪২,০৩,৩০০/-	
৫। নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ	২০	৬৭	৫,২১,০০০/-	৫,২১,০০০/-	

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঢাকা ও আশেপাশের বায়ুদূষণরোধে গৃহীত পদক্ষেপ

ঢাকা ও আশেপাশের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার সমন্বয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের করণীয় নির্ধারণ করে চূড়ান্ত নির্দেশিকা (গাইড লাইন) প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্দেশিকায় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বায়ু দূষণরোধে করণীয়সমূহ নির্ধারণসহ তা বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় শুস্ক মৌসুমে ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ (ধূলিদূষণ) নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৫/১২/২০২১ তারিখে ঢাকা শহরের আশেপাশের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয় নির্ধারণ ও মহামান্য হইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে প্রণীত নির্দেশিকা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহামান্য হইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে প্রণীত নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও সরকারি নির্মাণ কাজে ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০% ব্লক ব্যবহারের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বায়ু দূষণের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্তির লক্ষ্যে খসড়া বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়নপূর্বক লেজিলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

সার্বিক বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে

১) সরকারের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সরকারি নির্মাণকাজে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সরকার পোড়ানো ইটের পরিবর্তে ১০০% ব্লক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

২) শিল্প কারখানার দূষণ নিয়ন্ত্রণে বায়ুদূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে দুষণ নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তি ও লজিস্টিক সহযোগিতা প্রদান করা;

৩) রাস্তা, সড়ক বা মহাসড়কের পাশে সকল ধরনের বর্জ্য সংরক্ষণ ও পোড়ানো বন্ধ করতে হবে। পৌরবর্জ্য এবং গৃহস্থালি বর্জ্য খোলা অবস্থায় রাখা নিয়ন্ত্রণ করা। বাড়ির আশপাশ বাড়ির মালিক নিজে পরিস্কার করবে। বাড়ির আশপাশে ময়লা থাকলে জরিমানা আরোপ করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন এক্ষেত্রে প্রণোদনা ও শাস্তি এবং ট্যাক্স রিবেট দিতে পারে; পৌর বর্জ্য ও রোড ডাস্ট হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশনকে ভ্যাকুয়াম ডাস্ট ক্লিনারসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা করা;

৪) যানবাহনের দূষণ নিয়ন্ত্রণে নিঃসরণ মাত্রা পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান, অধিক পুরাতন এবং তুলনামূলক বেশি নিঃসরণকারী যানবাহনের বিরূদ্ধে নিঃসরণ কর আরোপ করা। ইতোমধ্যে বিআরটিএ কর্তৃক যেসব গাড়ীকে রাস্তায় চলাচলের অনুপযোগী ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলোর তালিকা তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

৫) সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ধারা ৩৬ অনুযায়ী যেসব গাড়ির Economic Life অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বিআরটিএ কর্তৃক যেসব গাড়ীকে রাস্তায় চলাচলের অনুপযুক্ত বা আনফিট ঘোষণা করা হয়েছে সেসকল যানবাহন বিআরটিএ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক দ্রুত রাস্তা থেকে প্রত্যাহার করা;

৬) ফুটপাত খোড়াখুড়ির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর ও সংস্থাসমূহ (যেমন-সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, ডেসকো, ডিপিডিসি, তিতাস, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর) পারস্পরিক সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়ন করা। দ্রুততম সময়ের মধ্যে খোড়া/ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা মেরামত করা; এক্ষেত্রে সিটি করপোরেশন মূল সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করা;

৭) নির্মাণ স্থানে যথাযথ অস্থায়ী বেস্টনী দেওয়া, বেস্টনীর ভেতর ও বাহিরে নির্মাণসামগ্রী (মাটি, বালি রড, সিমেন্ট ইত্যাদি) যথাযথভাবে আবৃত করে রাখা এবং বেষ্টনীর উভয়পাশ ধূলাবালি মূক্ত রাখার জন্য দিনে কমপক্ষে দুইবার স্প্রে করে পানি ছিটাতে হবে;

৮) শহরের অভ্যন্তরে নির্মাণসামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি) সম্পূর্ণ ঢেকে পরিবহণ নিশ্চিত করা;

৯) উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য রাস্তা খোঁড়াখুড়ির বিষয়ে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে না পারলে জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ আরোপ করা;

১০) রিয়েল টাইম এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা;

১১) পারিপার্শ্বিক বায়ুদূষণ রোধে Dust Sucker and smog vacuum cleaner স্থাপন করা।

১২) পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় সরকার Bangladesh Environmental Sustainability and Transformation (BEST) প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

এছাড়াও, আন্তঃসীমান্ত বায়ুদূষণ রোধে South Asia Cooperative Environment Programme (SACEP)-এর অধীনে Male Declaration এর মাধ্যমে আন্তঃসীমান্ত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে এর আওতায় সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ বিপজ্জনক রাসায়নিক ডিডিটিমুক্ত হতে যাচ্ছে

ফরিদ আহমেদ*
এহসান কবির**

ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশা নিধনের জন্য ১৯৮৫ সালে পাকিস্তান থেকে প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন ডিডিটি আমদানি করা হয়। এরপর থেকে নিম্নমান বিবেচনায় চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে কেন্দ্রীয় ওষুধাগারের গোডাউনে তা মজুদ রয়েছে।

Persistent Organic Pollutants (POPs)-এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানবদেহ, জীববৈচিত্র এবং পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে ২০০১ সালে স্টকহোম কনভেনশন গঠিত হয়। বাংলাদেশ একই বছর স্টকহোম কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। এ পর্যন্ত ১৭১টি দেশ কনভেনশনটি স্বাক্ষর করেছে। মানবদেহ, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতি বিবেচনায় ১৯৮৯ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও নিষিদ্ধ হয় এই রাসায়নিক। পরবর্তী দেশে স্টকহোম কনভেনশন বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Global Environment Fecility (GEF) এর অর্থায়ন এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির আওতায় দেশে স্টকহোম কনভেনশন বাস্তবায়নে মোট নয়টি প্রকল্প চিহ্নিত হয়। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি অন্যতম। বাংলাদেশ ২০০৭ সালে স্টকহোম কনভেনশন বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ২০০৯ সালে স্টকহোম কনভেনশন দাখিল করে।

* প্রকল্প পরিচালক, পেস্টিসাইড রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ
** কমিউনিকেশন এন্ড লার্নিং স্পেশালিস্ট, এফএও

Hazardous Waste Disposal কার্যক্রমে নিয়োজিত গ্রিসভিত্তিক Polyeco SA নামক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষিত অপারেটররা জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থা ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও)-এর বিশেষজ্ঞ এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ডিডিটি Disposal Operation পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমে নিয়োজিত দশজন দেশীয় শ্রমিককে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ পুলিশ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দশজন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম মহানগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থানের কারণে এ কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ সতর্কতা গ্রহণের প্রয়োজন হচ্ছে। ডিডিটি ছড়িয়ে পড়া রোধের লক্ষ্যে ঋণাত্মক বায়ুর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশসহ কোনো উন্নয়নশীল দেশেই ডিডিটি-এর মতো বিপজ্জনক বর্জ্য পরিশোধনের উপযুক্ত সুবিধা নেই। ডিডিটি অপসারণ করতে জলপথে বিশেষ জাহাজে করে ৪২টি নিরাপদ শিপিং কন্টেইনারে এসব রাসায়নিক দ্রব্য ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হবে। পথে ১২টি দেশের বন্দর হয়ে শেষ গন্তব্য ফ্রান্সে পৌঁছাবে ওই জাহাজ। সেখানকার দুটি ইনসিনারেটর প্লান্টে আন্তর্জাতিক আইন ও মান অনুসারে বিনষ্ট করা হবে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পেস্টিসাইড রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় এ অপসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্লাস্টিক বর্জ্য দূষণ এবং করণীয়

ড. মিহির লাল সাহা*

প্লাস্টিক বর্জ্য ও পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণের কারণে পরিবেশে স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট মানবস্বাস্থ্যের ওপর নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এছাড়া জীবজগতের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশও ব্যাহত হয়। বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, প্লাস্টিক দূষণ, পানিদূষণ, মাটিদূষণ, নদীদূষণ ও বর্জ্য অব্যবস্থাপনার নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে মানুষের শরীরের এবং জীবনযাত্রার ওপর। গাছপালা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিদিন গাছপালা ও ময়লা-আবর্জনা পোড়ানোর ফলে খুব সহজেই বায়ু দূষিত হচ্ছে। শিল্পায়ন এবং যানবাহন বৃদ্ধির কারণে কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ার ফলে প্রতিনিয়ত বায়ু দূষিত হচ্ছে। যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ এবং পচনশীল বর্জ্য থেকে নির্গত দুর্গন্ধ বায়ুতে মিশে বায়ুকে দূষিত করছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে অপচনীয় প্লাস্টিক বর্জ্য। কোনোভাবেই প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। ফলে মানবসভ্যতা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

প্লাস্টিক দূষণ হলো নানা কারণে প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ পরিবেশে যত্রতত্র ফেলা। আমরা সকলেই এই প্লাস্টিক ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এর দূষণ সম্বন্ধে জানার পরও সচেতনতার অভাবে বর্জ্য হিসেবে মাটিতে বা জলাশয়ে ফেলছি। নিয়মিত প্লাস্টিক পদার্থের ব্যবহার প্লাস্টিক দূষণের মাত্রাকে দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে। পলিথিন ব্যাগ, কসমেটিক প্লাস্টিক, গৃহস্থালির প্লাস্টিক, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের বেশিরভাগই অপচনীয় বজ্য। প্লাস্টিক এমন এক রাসায়নিক পদার্থ যা পরিবেশে পচতে অথবা কারখানায় পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করতে প্রচুর সময় লাগে। তাই একে "অপচনীয় পদার্থ" হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। এ কারণে প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। সাধারণত উদ্ভিদ, জলজ প্রাণী, দ্বীপ অঞ্চলের প্রাণীরা প্লাস্টিক বর্জ্যের কারণে মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে।

পলিথিন ব্যাগের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা কাজ করছে না বিধায় বর্ষাকালে জলাবদ্ধতাসহ ঢাকা শহর এখন বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। আমাদের জীবনযাত্রা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার পর গত এক দশকে ঢাকা শহরে পলিথিনের উৎপাদন ও ব্যবহার বেড়েছে তিন গুণ। শুধুমাত্র উদ্ভিদ বা জলজ প্রাণী নয়, মানুষও প্লাস্টিক দূষণের কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্লাস্টিক দূষণ পরোক্ষভাবে থাইরয়েড হরমোনের অতিরিক্ত ক্ষরণের জন্য দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তার মধ্যে অন্যতম। কারণ প্লাস্টিক অপচনশীল অবস্থায় দীর্ঘদিন পরিবেশে থেকে যায়। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য জানা গেছে যে, বিশ্বের মোট ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ৭৯ শতাংশ মাটিতে, ১২ শতাংশ পুড়িয়ে এবং মাত্র ৯ শতাংশ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। অর্থাৎ ৭৯ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্যই দীর্ঘদিন মাটি ও পানির পরিবেশে রয়ে যাচ্ছে। এর ফলে মাটি ও পানির বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে বাঁধাগ্রস্ত করছে।

প্লাস্টিক বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে চায়ের কাপ, মিনারেল ওয়াটার, জুস, কোমল পানীয় বোতল, প্লাস্টিকের পলিব্যাগ ও প্লাস্টিকের চালের বস্তা। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা শহরে দৈনিক ৬৪৬ টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৩২৮টি পৌরসভায় বর্জ্য উৎপাদনের হার বেড়েই চলছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর ৮,২১,২৫০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়। যার মধ্যে মাত্র ৫,২৭,৪২৫ টন প্লাস্টিক পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করা হয়। বাকিগুলো পড়ে থাকে সম্পূর্ণ অব্যবস্থাপনায়। বাংলাদেশে প্রায় ৩ শতাধিক প্লাস্টিক রিসাইক্লিং কারখানা থাকলেও দেশজুড়ে উৎপন্ন প্লাস্টিক বর্জ্যের কেবল অর্ধেক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ক্লোরিনযুক্ত প্লাস্টিক বজ্য থেকে নির্গত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ভূগর্ভস্থ পানি ও ভূপৃষ্ঠীয় পানির সাথে মিশে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে মিশে যাওয়া বিষাক্ত পদার্থ ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠীয় পানির মাধ্যমে আমাদের খাদ্যচক্রে প্রবেশ করছে। সেই দূষিত পানি গ্রহণের মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছি। মাটিতে বা পানিতে বিভিন্ন ধরনের অণুজীব বাস করে যা প্লাস্টিক অণুর ভাঙনে সাহায্য করে। এইসকল অণুজীবের মধ্য Pseudomonas, "নাইলন খাদক ব্যাকটেরিয়া, ফ্লাভোব্যাকটেরিয়া অন্যতম। এইসকল ব্যাকটেরিয়া "নাইলোনেজ" এনজাইম নিঃসরণের মাধ্যমে নাইলন অণুকে ভেঙ্গে ফেলে। জীবাণুবিয়োজ্য প্লাস্টিক ভাঙনের মাধ্যমে গ্রীণহাউজ গ্যাস 'মিথেন' উৎপন্ন হয়। এটি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী। প্লাস্টিক দূষণ প্রাণীজগতের খাদ্যচক্রের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে।

*অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ ও প্রাধ্যক্ষ, জগন্নাথ হল; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২

সমুদ্রে যে হারে প্লাস্টিকের বোতল ও পলিথিন বাড়ছে এ অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতের জন্য পৃথিবীতে মারাত্মকভাবে নেতিবাচক প্রভাবে ফেলবে। সমুদ্র বিজ্ঞানীদের মতে সমুদ্রের পানির উষ্ণতা বৃদ্ধির পর দ্বিতীয় বড় হুমকিটি হলো প্লাস্টিক বর্জ্য।

সামুদ্রিক প্রাণীর উপর প্লাস্টিক দূষণের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। প্লাস্টিক দূষণের কারণে সামুদ্রিক কাছিমের মৃত্যু ঘটছে। সামুদ্রিক কাছিম সাধারণত জেলিফিশ, সামুদ্রিক প্রাণী খেয়ে জীবনধারণ করে। জেলিফিসের আকার ও আকৃতি প্লাস্টিক ব্যাগের মত হওয়ায় কচ্ছপ ভুল করে প্লাস্টিক ব্যাগ খেয়ে ফেলে। এই ভুলের কারণে তাদের খাদ্য নালিকা বন্ধ হয়ে যায়। খাদ্যগ্রহণ করতে অক্ষম হওয়ায় ধীরে ধীরে মারা যায়। এর চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সামুদ্রিক তিমি। সামুদ্রিক তিমির পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক পাওয়া গিয়েছে। এমনকি সামুদ্রিক ছোট মাছের পাকস্থলীতেও প্লাস্টিক পাওয়া গিয়েছে। তাই মানবসৃষ্ট প্লাস্টিক দূষণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। মাটির প্রাণ ছোট ছোট অণুজীবগুলো চিৎকার করে বলছে, "হে মানবজাতি তোমরা এ কী করছ? কেন মাটিকে উর্বর রাখতে আমাদের কাজ করতে বাধার সৃষ্টি করছ? মাটির বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করা তোমাদের নৈতিক কর্তব্য"। প্লাস্টিক দূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। সাধারনত প্লাস্টিককে আকর্ষণীয় করতে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক রঞ্জক মেশানো হয়। এ সকল রঞ্জক পদার্থ কার্সিনোজেন বা ক্যানসার সৃষ্টক হিসেবে কাজ করে ও এন্ডোক্রাইনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ২০২২ সালের মার্চে প্রকাশিত এক গবেষণা ফলাফলে মানুষের রক্তে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ শনাক্ত হয়। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮০ শতাংশ মানুষের রক্তে এই ক্ষুদ্র কণা শনাক্ত হয়। এই খবরটা আমাদেরকে ভয়ানকভাবে আতঙ্কিত করে।

প্লাস্টিকের দ্রব্যাদি মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি (পেট্রোলিয়াম তেল) থেকে পলিমার হিসেবে তৈরি করা হয়। প্রস্তুতকালে নানারকম সংযোজনকারী জৈব যৌগ যোগ করা হয়। পরিবেশে গিয়ে সেই সব প্লাস্টিক বর্জ্য নানারকম মারাত্মক বিপজ্জনক জৈবযৌগ নিঃসরণ করছে। তার মধ্যে বিসফেনল, বিসফেনোন, এবং পলি ক্লোরিনেটেড বাই-ফিনাইলস উল্লেখযোগ্য। এসব রাসায়নিক পদার্থ মানব দেহের হরমোনাল সিস্টেমকে নষ্ট করে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ স্নায়ুতন্ত্র এবং মস্তিষ্কের কোষগুলোকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিভিন্ন ধরণের প্লাস্টিক বর্জ্য নিঃসৃত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ জীবের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্যানসারসহ নানারকম দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্লাস্টিক দূষণরোধে করণীয়

সিটি কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করতে হবে এবং জনসাধারণকে নাগরিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হবে। প্লাস্টিক এবং পচনশীল বর্জ্য ফেলার জন্য নির্দিষ্টস্থানে পৃথক পৃথক বিন স্থাপন করে নির্ধারিত স্থানেই নির্ধারিত বর্জ্য ফেলার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। পানীয়জাত দ্রব্যের প্লাস্টিকে বাজারজাতকরণ বন্ধ করে কাঁচের বোতল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রতিদিনের বাজারে এবং কেনাকাটায় প্লাস্টিক বা পলিথিনের পরিবর্তে পচনশীল পাট ও কাপড়ের তৈরি মোড়ক বা থলে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে। লন্ড্রিতে সম্পূর্ণভাবে পলিথিনের ব্যাগ বন্ধ করে বারবার ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের ব্যাগ চালু করতে উৎসাহিত করতে হবে। বর্জ্য দূষণরোধে নাগরিক সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। সরকারকে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণের কারণ, ক্ষতিকর দিক ও পরিত্রাণের উপায় সম্বলিত জনসচেতনতামূলক প্রচারের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবনেঃ নদী-বৃক্ষ-পাখি সুরক্ষায় করণীয়

অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদ*

প্রকৃতির সমস্ত কিছুই একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত। সময় যতই সভ্যতার পথে হাঁটছে এই বোঝাপড়া ততই দৃঢ় হয়েছে। প্রকৃতিতে বিচ্ছিন্ন বলে কিছু নেই। অভিন্নসূত্রে গাঁথা সবকিছু। নদী-বৃক্ষ-পাখির সাথে মানুষের জীবনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষ। প্রকৃতির ওপর মানুষ বুদ্ধি দিয়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই বলে মানুষ এমন কোনো পথ বিনির্মাণ করতে পারেনি যে পথে প্রকৃতির সবকিছুর ওপর নির্ভরতা ছেড়ে দিয়ে বাঁচা যায়। ফলে মানুষ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী হলেও তার নির্ভরতা প্রকৃতির সব কিছুরই ওপর। নদী, বৃক্ষ এবং পাখি ছাড়াও পরিবেশের উন্নয়নে প্রকৃতিরই আরও অনেক বিষয় রয়েছে। এ লেখায় তিনটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

নদীর সাথে মানুষের জীবনের সম্পর্ক বিবিধ মাত্রার। অতীতে মানুষ নদীর পানি নিয়মিত পান করেছে। এখনো অনেকে নদীর পানি পান করে। আমাদের দেশে শুধু নয় বিশ্বব্যাপী সভ্যতার বিকাশে নদী অপরিসীম ভূমিকা রেখেছে। সভ্যতার সূচনালগ্নে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে নদীই ছিল একমাত্র অবলম্বন। ফলে প্রাচীন নগর গড়ে উঠেছিল নদীকেন্দ্রিক। বাংলাদেশে যত স্থানের নামের সাথে গঞ্জ আছে, খোঁজ নিলে জানা যায় তার সবগুলোই কোন না কোন নদীর পাড়েই গড়ে উঠেছে।

নদী আমাদের বৈচিত্র্যময় প্রাণের আধার ছিল। বিচিত্র প্রাণী বেঁচে ছিল নদীতে। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও দেশের অসংখ্য মাঝারি এবং বড় বড় নদীতে শুশুকসহ অনেক কিছুই ছিল। বর্তমানে কয়েকটি নদীতে এখন শুধু দেখা যায় শুশুক। মৌসুম আর নদীর আকৃতি ভেদে একেক নদীতে একেক ধরনের মাছ, পোকামাকড়ের বসতি। এখন নদীর বিচিত্র প্রজাতি লুপ্ত হয়েছে। আগামীতে অনেক প্রাণী বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে নদীর গুরত্ব কিংবা প্রয়োজনীয়তা এখনো অনেক। আমাদের দেশে যেসব নদী আছে এই নদীই সারাবছর ধরে নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। দেশের মোটামুটি সব জেলার সাথে নৌ যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী পঞ্চগড় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত নৌযোগাযোগ স্থাপন করার কথা বলেছেন। বাস্তবে এ কাজ করা খুব সহজ। আমাদের মুক্তিযদ্ধের সাথেও নদীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সৈয়দ শামসুল হক নদীকে গেরিলা যোদ্ধার সাথে তুলনা করেছেন। জালের মত ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশের নদীগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির আক্রমণ রোধে অনেকটা গেরিলার ভূমিকা পালন করেছে। কুড়িগ্রামে রৌমারী-রাজিবপুর দেশের সবচেয়ে বড় মুক্তাঞ্চল। এর নেপথ্যে নদীর ভূমিকা।

আমাদের দেশে জালের মত ছড়িয়ে আছে অগণিত নদী। আজ পর্যন্ত দেশের নদীর সংখ্যা চিহ্নিত করা যায়নি। সৈয়দ শামসুল হক তার কবিতায় অনেকবার তেরশত নদীর কথা উল্লেখ করেছেন। নদীর প্রকৃত সংখ্যা কারো কারো মতে এখনো দুই সহস্রাধিক। ছোট-বড়-মাঝারি অনেক নদী আজ বিলুপ্ত হয়েছে। এই বিলুপ্তর প্রধানতম কারণ মানুষ। একদিকে নদীর উপযুক্ত পরিচর্যার অভাব অন্যদিকে নদীর অবৈধ দখল-দূষণ।

আমাদের দেশ কৃষিনির্ভর। আমাদের সংস্কৃতি-সভ্যতা নদীপ্রভাবিত। আমাদের ভবিষ্যৎ নদীকে বাদ দিয়ে নয়। আমাদের ভূমি, আমাদের মন ও মনন গঠনের সাথে নদীর প্রভাব রয়েছে। বলা যায় আমাদের জীবনের পরতে পরতে নদীর প্রভাব জড়িয়ে আছে। এই নদী আজ বিপন্ন। এই নদীকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখার কোনো বিকল্প নেই।

২০১৫-২০১৬ সালে আমরা রিভারাইন পিপলের উদ্যোগে সারাদেশে জাতীয় রিভার অলিম্পিয়াড এর আয়োজন করেছিলাম। মূলত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নিয়েছিল। এই অলিম্পিয়াডে আমরা সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম তা হচ্ছে– ‘নদীর জন্য আমি কী করতে পারি?’

এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি নদী সুরক্ষায় ‘আমি’র গুরুত্বটাই সবচেয়ে বেশি। যে আদলে নদীর জন্য কাজ করা হোক না কেন সর্বত্রই কোন না কোন ব্যক্তিকেই ভূমিকা পালন করতে হয়। কিন্তু ব্যক্তি এককভাবে নদী রক্ষা করতে পারবে না। নদী রক্ষা করার কাজ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। তবে ব্যক্তির নির্দেশনা, পরবর্তী স্তরে ব্যক্তির উদ্যোগ নদী রক্ষায় একেকটি ভিত্তি। আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে নদী দখল হয়ে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নদীর পানি বাধাহীন করার ক্ষেত্রে যতবার অনুশাসন দিয়েছন এতবার অনুশাসন দিতে আর কোন প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশে কখনো দেখা যায়নি। প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা থাকার কারণেই প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ নেওয়া সহজ হচ্ছে। ফলস্বরূপ আমরা সারাদেশে নদী উদ্ধারের বিশাল কর্মযজ্ঞ লক্ষ করছি। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তিরও অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া দেশবাসীর কাছে দারুণ আশাজাগানিয়া। এখন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করে আমাদের দেশের নদীগুলো আজ হোক কাল হোক অবৈধ দখল মুক্ত হবে। ব্যক্তির ভূমিকা সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে। একজন শিক্ষার্থী নদী সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করবে। একজন শিক্ষক নদীপ্রেম শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগ্রত করবেন। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নদীবান্ধব পরিবেশনা প্রয়োজন আছে। রাজনীতিকগণকেও নদীর জন্য নিবেদিত হওয়া চাই। নদীর জন্য কাজ করা সবসময়ই সম্মানজনক

* শিক্ষক, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

কোথাও নদী দখল-দূষণ কিংবা নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন করতে দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানাতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব না হলে নদী রক্ষায় সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে। সমাজে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনও ভালো কাজ করতে হবে। সরকারের কাছে মাঠের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হবে। শুধু সরকারি চাকুরিজীবীদের দায়িত্ব নদী রক্ষা করা এমনটি ভাবলে ভুল হবে। আমাদের সবার যৌথ উদ্যোগে আমাদের নদীসমূহ রক্ষা পাবে। কখনো যৌথ চেষ্টা ব্যক্তিকে নদীর জন্য প্রস্তুত করবে কখনো ব্যক্তির তাড়না থেকেও যৌথ চেষ্টা দাঁড়াতে পারে। যেভাবেই হোক নদীকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা জারি রাখতে হবে।

বাংলাদেরে মাটি খুব উর্বর। এ মাটিতে গাছ রোপণ করা ছাড়াও পাখির ফল খেয়ে বীজ ফেললে সেখান থেকে কোন পরিচর্যা ছাড়া বৃক্ষ জন্ম নেয় এবং ফল দেয়। কোথাও নতুন মাটি কেটে ফেললেও কয়েকদিন পর সেখানে নানা রকম সবুজ গাছ-লতা-গুল্ম জন্মাতে দেখা যায়। আমাদের দেশের গ্রামগঞ্জে অনেক ঝাড়জঙ্গল ছিল। সেসব জঙ্গলে অসংখ্য বন্য প্রাণী ছিল। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে এবং সচেতনতার অভাবে আমারে বৃক্ষরাজি ধ্বংস হয়েছে। আমাদের দেশে পর্যাপ্ত বনভূমি নেই। অথচ আমাদের দেশে এখনো অনেক জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। সড়কের পাশে, বাড়ির উঠানে, সরকারি কার্যালয়ে, নদী-বিলের ধারে অনেক জায়গা পড়ে আছে। এসব জায়গায় বৃক্ষরোপণ করা সম্ভব।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশে অনেক সময় বৃক্ষরোপণ করা হয় লোক দেখানো। ফেসবুক সংস্কৃতি চাল হওয়ার পর বৃক্ষরোপণ ছবি তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। বৃক্ষরোপণ করার পর যে দুই থেকে তিন বছর পরিচর্যা করতে হয়, তাকে গরু-ছাগল, বন্যা, আগাছা থেকে রক্ষা করতে হয় এই বিবেচনাবোধের যথেষ্ট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বৃক্ষরোপণ করে সেগুলো বড় করে তোলা কঠিন কাজ। তবে অসম্ভব নয়। আমি নিজেই প্রায় অর্ধলক্ষ গাছ রোপণ করার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এর মধ্যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩৬ হাজার বৃক্ষ রোপণ করেছি। এই অভিজ্ঞতায় আমার পর্যবেক্ষণ হলো গাছের প্রতি ভালোবসা থাকলে এবং কিছুটা দায়িত্বশীল হলে বৃক্ষরোপণ-পরিচর্যা করা সম্ভব।

আমাদের দেশে দেশী ফলদ-বনজ-ওষধি অনেক কাজ আজ লুপ্ত হচ্ছে। এ প্রজাতিগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। সরকারিভাবে জেলায় জেলায় কিংবা উপজেলায় কয়েক একর জমি অধিগ্রহণ করে এলাকাভিত্তিক দেশের সব প্রজাতির অন্তত দুটি করে বৃক্ষ রোপণ করে রাখা প্রয়োজন। যাতে দেশ থেকে কোন প্রজাতির বৃক্ষ লুপ্ত হয়ে না যায়। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি-সংগঠন-সংস্থা (সরকারি-বেসরকারি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাখির নিরাপদ আবাসের ক্ষেত্রসমূহ কমে আসছে। এ পর্যন্ত দেশে ৭১৯ প্রজাতির পাখি দেখার রেকর্ড আছে। এর মধ্যে অকেগুলো গত ২০ বছর ধরে আর দেখাই যায় না। কোন প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়েছে। আমাদের নদীর পাখি কমে গেছে। কারণ নদী কমে গেছে। আমাদের জলাশয় কমে গেছে। ফলে জলাশয়ের পাখি কমে গেছে। আমাদের বনাঞ্চল লোপ পেয়েছে। ফলে বনের পাখি কমেছে। অনেক অসাধু পাখি শিকারী পাখি মেরেও পাখি কমিয়েছে। আমাদের দেশে আগের তুলনায় পাখিদের পরিযায়ন কমেছে। গোটা বিশ্বে পাখির সংখ্যা কমছে। তবে বাংলাদেশে কমছে আশঙ্কাজনক হারে। অনেক সভ্য মানুষ ফল কিংবা মাছ সুরক্ষার জন্য কারেন্টের জাল ব্যবহার করে। এতে প্রতি বছর প্রচুর পাখি মারা যায়। আমাদের দেশের বিল-জলাশয় বন্দোবস্ত দেওয়ার কারণে তারা এমনভাবে ওষুধ প্রয়োগ করে যে সেখানে আর পাখি আসেনা। আমি দীর্ঘদিন ধরে পাখি সুরক্ষায় কাজ করছি। আমি দেখেছি এখনো অনেকে পাশবিতকতার পরিচয় দিয়ে পাখি মেরে খায়। পাখির আবাস ও খাদ্যের কথা বিবেচনায় নিয়ে নদী-খাল-বিল-জলাশয়-বন সুরক্ষার কাজ করতে হবে।

নদী-বৃক্ষ-পাখি একটির সাথে আরেকটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অনাদিকাল থেকে ভূমিকা পালন করে আসছে। মানুষের জীবন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে এই প্রকৃতির প্রধান তিন অনুষঙ্গ অনন্তকালব্যাপী ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু সেজন্য মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। নদী-গাছ-পাখির সর্বনাশ করে বাঙালির পক্ষে সুস্থ-স্বাভাবিক যাপিত জীবন অসম্ভব। সেজন্য নিজ নিজ জীবন, উত্তর প্রজন্ম সর্বোপরি মানুষের কথা ভেবে হলেও নদী-বৃক্ষ-পাখি সুরক্ষায় সবারই এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার প্রস্তুতি এখন কালের দাবি। এই প্রস্তুতি একক দেশ হিসেবে কোন দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে অখণ্ড পৃথিবীর মানুষকে একটি সিদ্ধান্তে আসতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। অখণ্ড পৃথিবীর জন্য অভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদারতা ক্ষমতাধর দেশগুলো ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেনি। বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছেন জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ কাজের জন্য। জলবায়ুর অভিঘাত থেকে রক্ষা পেতেও নদী-বৃক্ষ-পাখি সুরক্ষার কাজ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের টেকসই জীবনের কথা ভাবলেও উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে অবহেলার কোন সুযোগ নেই। সঙ্গত কারণে এ বছর পরিবেশ দিবসের শ্লোগান– 'একটাই পৃথিবী' ও প্রতিপাদ্য 'প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমাদের নদী-বৃক্ষ-পাখির সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হলে পরিবেশের ওপর তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বেই।

চিকিৎসা বর্জ্যের ঝুঁকি: বিশ্ব ও বাংলাদেশ

অধ্যাপক মোঃ আব্দুল হাই*

বর্তমান বিশ্বে চিকিৎসা সেবাদাতাদের কাছে চিকিৎসা বর্জ্যের সৃষ্টি, সংগ্রহ ও অপসারণ একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পরিবেশের উপর চিকিৎসা বর্জ্যের মারাত্মক প্রভাব রয়েছে। চিকিৎসা বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা থেকে নানা ধরনের অসুখ সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চিকিৎসা বর্জ্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি এই ঝুঁকিকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। উচ্চ আয়ের দেশগুলোর চেয়ে মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে সাধারণত চিকিৎসা বর্জ্যের পরিমাণ কম হয়ে থাকে (WHO, 2004)। তবে নিয়ম মেনে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলাদা করতে পারলে ও সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারলে চিকিৎসা বর্জ্যের পরিমাণ যেমন কমে যায় তেমনি ঝুঁকিও অনেক হ্রাস পায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চিকিৎসা বর্জ্যের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না। একে সাধারণ গৃহস্থ আবর্জনার মত গণ্য করা হয় এবং গৃহস্থ আবর্জনার সঙ্গে যত্রতত্র ভাগাড়ে নিক্ষেপ করা হয়।

বাংলাদেশে নগরায়নের উচ্চহার, শিক্ষার নিম্নহার এবং সার্বিকভাবে পরিবেশ দূষণের উচ্চহারের কারণে চিকিৎসা বর্জ্যের দূষণ পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থাকে কঠিন করে তুলছে চিকিৎসা বর্জ্যের দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থাহীনতা। ফলে চিকিৎসা সেবার সঙ্গে জড়িত ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ডবয়, ল্যাব টেকনিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতাকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ দর্শনার্থী পযন্ত নানা ধরনের কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। আবার মাটি জল ও বাতাসেও দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে Covid-19 জনিত কারণে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়া, সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সার্জিক্যাল মাস্কের ব্যবহার বৃদ্ধি ও ব্যবহার শেষে যত্রতত্র মাস্কের নিক্ষেপন এবং ভ্যাকসিন প্রদান ও ব্যবহৃত নিডলের নিক্ষেপ চিকিৎসা বর্জ্যের ঝুঁকির বিষয়টিকে আবার সামনে নিয়ে এসেছে।

চিকিৎসা বর্জ্য কি?

যেকোনো ধরনের বর্জ্য, যদি তা থেকে সংক্রমণের সম্ভাবনা বা ভয় থাকে তবে তাকে চিকিৎসা বর্জ্য বলা হয়। অর্থাৎ চিকিৎসা সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোন ধরনের বজ্য যেগুলো ডাক্তারের অফিস, হাসপাতাল, ল্যাবরেটরীতে চিকিৎসা গবেষণা ক্ষেত্র, দন্ত চিকিৎসকের চেম্বার, ব্লাডব্যাংক, উল্কি পার্লার, দেহ আর্ট পার্লার, প্রবীণদের জন্য নার্সিংহোম এবং পশু হাসপাতাল থেকে উৎপন্ন হয় তার সবকিছুই চিকিৎসা বর্জ্যের অন্তর্ভুক্ত। আবার শরীর থেকে নির্গত যেকোনো ধরনের তরল যেমন রক্ত ও অন্য যে কোনো দূষিত পদার্থ ও এর মধ্যে পড়ে।

১৯৮৮ সালের "মেডিকেল ওয়েস্ট ট্রাকিং এ্যাক্ট" এর সংজ্ঞা অনুযায়ী চিকিৎসা গবেষণা, পরীক্ষণ, রোগ নির্ণয়, প্রতিষেধক প্রদান অথবা মানুষ ও প্রাণীর চিকিৎসা দিতে গিয়ে উদ্ভূত যে কোনো বর্জ্যকে হাসপাতাল বর্জ্য বলে। যেমন: কালচার করা ডিশ, যে কোন কাঁচের পাত্র (স্লাইড, বিকার, ফানেল, টিউব), গজ, ব্যান্ডেজ, তুলা, মাস্ক, গাভস, বাতিল হওয়া ছুরি-কাঁচি, সূচ, স্যালাইন ব্যাগ, অ্যাম্পুল, রক্তের ব্যাগ, সংগৃহীত লালা, শ্লেষ্মা বা কফের নমুনা, দেহরস, টিস্যু, টিউমার, মানব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি।

চিকিৎসা বর্জ্যের বিভিন্ন নাম:

চিকিৎসা বর্জ্যকে ভিন্ন ভিন্ন অনেক নামে অভিহিত করা হলেও সবগুলোর মৌলিক বিষয়বস্ত এক। অর্থাৎ চিকিৎসাসেবা দিতে গিয়ে উদ্ভূত যে কোনো ধরনের বস্তু, যেটা থেকে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে তাকেই চিকিৎসা বর্জ্য বলে। চিকিৎসা বর্জ্যের প্রচলিত নাম গুলো হলো: মেডিকেল বর্জ্য, বায়োমেডিকেল বর্জ্য, ক্লিনিক্যাল বর্জ্য, বায়োহ্যাজার্ডাস বর্জ্য, রেগুলেটেড মেডিকেল বর্জ্য (RMW), ইনফেকশাস মেডিকেল বর্জ্য, হেলথকেয়ার বর্জ্য প্রভৃতি। সংজ্ঞাগত দিক থেকে একই ধরনের অর্থ নির্দেশ করলেও এগুলোর মধ্যে একটি সূক্ষ পার্থক্য রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এ ধরনের বর্জ্যকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছে।

১। সাধারণ চিকিৎসা সেবা সম্পর্কিত বর্জ্য (General health care waste) সংক্রমণের সম্ভাবনাহীন যে কোন বস্ যেমন- প্রাণীর টিস্যু, অফিস পেপার, ঝাড়ুযোগ্য আবর্জনা, রান্নাঘর আবর্জনা প্রভৃতি।

২। ঝুঁকিপূর্ণ বা বিপজ্জনক চিকিৎসা বর্জ্য (Hazardous biomedical waste) চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত যে কোন তীক্ষ্ণ ও ধারালো বস্তু যেমন: নিডল, ছুরি-কাঁচি , ব্লেড এবং মানব টিস্যু, তরল ও সংক্রমণের সম্ভাবনাসহ যে কোন বস্তু।

ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যগুলো কে আবার আরো দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

ক) রেড ব্যাগ: দূষিত বা সম্ভাব্য দূষিত পদার্থের জন্য ব্যবহৃত। এটি রক্ত ও অন্যান্য সম্ভাব্য সংক্রামক পদার্থ (OPIM) ধারণ করে।

খ) তীক্ষ্ণ বা ধারালো (SHARPS) হাইপোডার্মিক সূঁচ, স্ক্যালপেল (Scalpel) প্রভৃতি।

চিকিৎসা বর্জ্যের উৎস: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(WHO) ও চিকিৎসা (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ চিহ্নিত বর্জ্যের উৎস গুলো নিম্নরূপ:

- স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চিকিৎসকের অফিস, ডেন্টাল ক্লিনিক, বহির্বিভাগীয় রোগী ক্লিনিক, ধাত্রীবিদ্যা ও প্রসূতি ক্লিনিক, আকুপাংচারবিদ, কাইরোপ্রেক্টর প্রভৃতি;
- পরীক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্র;

*ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

- নার্সিংহোম, মনোরোগ হাসপাতাল, বিকলাঙ্গ প্রতিষ্ঠান;
- শবাগার ও ময়নাতদন্ত কেন্দ্র;
- ব্লাড ব্যাংক ও রক্ত সংগ্রহ সেবা;
- সৌন্দর্যবর্ধক কান ছিদ্রকরণ, উল্কি আঁকার ঘর;
- শব সৎকার ও অ্যাম্বুলেন্স সেবা;
- বৃদ্ধদের নার্সিংহোম;
- প্রাণী গবেষণা পরীক্ষা ও চিকিৎসাকেন্দ্র প্রভৃতি।

চিকিৎসা বর্জ্যের ধরন:

চিকিৎসা বর্জ্য শব্দের ব্যাপকতা গভীর। চিকিৎসাসামগ্রী উৎপাদন থেকে শুরু করে চিকিৎসা গবেষণা এবং হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দিতে গিয়ে যত ধরনের উপজাত ও উচ্ছিষ্ট তৈরি হয় তার সবকিছুই চিকিৎসা বর্জ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই চিকিৎসা বর্জ্যের তালিকাও দীর্ঘ হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আট ধরনের বর্জ্যের উল্লেখ করেছে। তার সঙ্গে আরো তিনটি যুক্ত করে চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এ ১১ (এগারো) ধরনের বর্জ্যের তালিকা করা হয়েছে।

তীক্ষ্ণ বা ধারালো বর্জ্য:

আমাদের ত্বক ভেদ করতে পারে এমন যে কোন ধারালো বস্তু যেমন: সকল প্রকার সূঁচ, ব্লেড, ভাঙ্গা স্লাইড, ব্যবহৃত অ্যাম্পুল, ভাঙ্গা বোতল, কাঁচ, টেস্টটিউব, পিবোট, জার, নেইল, রেজর, স্টিলের তার, অর্থোপেডিক কাজে ব্যবহৃত স্ক্রু, স্টিল, পেট, পিন ইত্যাদি।

সংক্রামক বর্জ্য:

সংক্রামক অথবা সংক্রমণের সম্ভাবনা আছে এরকম যেকোন বস্তু যেমন- সোয়াব (কফ, থুতু, লালা, শ্লেষ্মা), রক্ত/ পুঁজ/ দেহরস দ্বারা সংক্রমিত গজ, ব্যান্ডেজ, তুলা, স্পঞ্জ, মব, প্লাস্টার, ক্যাথেটার, ড্রেনেজ টিউব, রক্ত সঞ্চালনের ব্যাগ/ টিউব, রক্ত দ্বারা সংক্রমিত স্যালাইন সেট, জমাট বাঁধা রক্ত, দেহরস, ডায়রিয়া রোগীর সংক্রমিত কাপড়চোপড়, সংক্রমিত সিরিঞ্জ, মানুষ ও প্রাণীর দেহ নির্গত বর্জ্য (ঘাম, মল, মূত্র), নিষ্পত্তিযোগ্য চিকিৎসা যন্ত্রাদি ও ল্যাব কালচার, বাতিল হওয়া ডায়াগনস্টিক নমুনা, ময়না তদন্ত সংশ্লিষ্ট বর্জ্য প্রভৃতি।

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য:

রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটোপ, তেজস্ক্রিয় বস্তু দ্বারা সংক্রমিত সকল বর্জ্য, অব্যবহৃত এক্সরে মেশিনের হেড অথবা সংক্রমিত যে কোনো গাসওয়ারও হতে পারে।

প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য:

ল্যাবরেটরি কালচার, মজুদ অথবা বিভিন্ন টিকার নমুনা, বায়োলজিক্যাল টক্সিন, পরীক্ষার জন্য দেওয়া রক্ত, কফ, মল-মূত্র, সিরাম, টিস্যু, অস্থিমজ্জা, শরীরের নিঃসরণ ইত্যাদি।

এনাটমিকাল বর্জ্য:

মানবদেহের কেটে ফলা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, টিস্যু, অপসারণ করা টিউমার, গর্ভফুল, গর্ভপাত/ গর্ভসংক্রান্ত বর্জ্য, সংক্রমিত প্রাণী দেহ বা দেহাবশেষ প্রভৃতি।

ফার্মাসিটিউক্যাল বর্জ্য:

অব্যবহৃত, মেয়াদ উত্তীর্ণ ও নষ্ট হয়ে যাওয়া ভ্যাকসিন, ঔষধ, অ্যান্টিবায়োটিক, ইনজেকশন এবং নানা ধরনের পিল।

রাসায়নিক বর্জ্য:

ল্যাবরেটরিতে সংক্রমণরোধের জন্য ব্যবহৃত নানা ধরনের দ্রবণ, চিকিৎসা সামগ্রী ও যন্ত্রে ব্যবহৃত ভারী ধাতব যেমন: মার্কারি (ভাঙা থার্মোমিটার থেকে নির্গত হয়ে থাকে), ব্যাটারির জন্য ব্যবহৃত দ্রাবক ও রিএজেন্ট, ডায়ালাইসিস এ ব্যবহৃত রাসায়নিক ইত্যাদি।

জেনোটক্সিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত বর্জ্য:

উচ্চমাত্রার বিপজ্জনক চিকিৎসা বজ্য যেমন: ক্যান্সার চিকিৎসা থেকে উদ্ভূত, অস্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় চিকিৎসা থেকে উদ্ভূত, বংশগতি সম্পর্কিত চিকিৎসা থেকে উদ্ভূত এবং এন্টিক্যানসার ড্রাগ থেকে সৃষ্ট বর্জ্য।

সাধারণ অনিয়ন্ত্রিত চিকিৎসা বর্জ্য:
বিপজ্জনক নয় এমন যে কোন চিকিৎসা বর্জ্য (বিশেষ কোন রাসায়নিক, জৈবিক, দৈহিক অথবা তেজস্ক্রিয় ঝুঁকি সৃষ্টি করে না এ ধরনের বর্জ্য), ব্যবহার্য কাগজ/ মোড়ক, প্লাস্টিক বা ধাতব কৌটা, ওষুধের স্ট্রিপ, খালি বাক্স ও কার্টুন, প্যাকিং বাক্স, পলিথিন ব্যাগ, মিনারেল পানির বোতল, কাঁচের খালি বোতল, বিস্কুটের মোড়ক, ইনজেকশনের খালি ভায়াল, অসংক্রমিত ব্যবহৃত স্যালাইন ব্যাগ ও সেট, অসংক্রমিত ব্যবহার্য সিরিঞ্জ, অসংক্রমিত কাপড়, গজ, তুলা, অসংক্রমিত রাবার দ্রব্য, কর্ক, ফলমূলের খোসা, ডাবের মালা, প্রেসারাইজ খালি কৌটা ইত্যাদি।

তরল বর্জ্য (সংক্রমিত ও অসংক্রমিত):
ব্যবহৃত পানি, পানের পিক, বমি, কফ, সাকশন করা তরল, পুজ, দেহরস, সিরাম, তরল রক্ত, গর্ভের পানি, তরল রাসায়নিক দ্রব্য, বীর্য, যোনি স্রোব, সেরিব্রো স্পাইনাল তরল, অব্যবহৃত তরল ঔষধ, ড্রেনেজ ব্যাগের তরল বর্জ্য ইত্যাদি।

প্রেসারাইজ বর্জ্য:
প্রেসারাইজড কৌটা, ক্যান, কন্টেইনার ইত্যাদি

চিকিৎসা বর্জ্য নিষ্পত্তির পদ্ধতি:
- ইনসিনারেশন- উচ্চতাপে পোড়ানো। এনাটমিকাল, প্যাথলজিক্যাল এবং ফার্মাসিটিউক্যাল বর্জ্য নিষ্পত্তির প্রচলিত জনপ্রিয় পদ্ধতি।
- অটোক্লেভিং- উচ্চচাপযুক্ত গরম বাষ্পের মাধ্যমে বর্জ্য জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি। তীক্ষ্ণ ও ধারালো বর্জ্যের জন্য ব্যবহৃত।
- মাইক্রোওয়েভিং- ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় এবং জেনোটক্সিক বর্জ্যের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি।
- রাসায়নিক পদ্ধতি- রক্ত এবং তরল বর্জ্যের জন্য ব্যবহৃত।
- বায়োলজিক্যাল পদ্ধতি- সাধারণ এবং অসংক্রমিত বর্জ্যের জন্য ব্যবহৃত। মূলত মাটিচাপা দিয়ে নিষ্পত্তিকরণ।

চিকিৎসা বর্জ্যের সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকি:
চিকিৎসা বর্জ্যে সম্ভাব্য ক্ষতিকারক অণুজীব থাকে যা চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ডবয় থেকে শুরু করে চিকিৎসা সেবার সঙ্গে জড়িত সকল পেশাজীবী, রোগী এবং সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। আবার ড্রাগ প্রতিরোধী অণুজীবগুলো স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রগুলি থেকে পরিবেশে ছড়িয়ে অন্যান্য সম্ভাব্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। স্বাস্থ্যসেবা বর্জ্য এবং উপজাত দ্রব্যগুলি থেকে সম্ভাব্য যে সকল বিপদ হতে পারে:
- তীক্ষ্ণ ও ধারালো বর্জ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের জখম হতে পারে।
- ফার্মাসিটিউক্যাল পণ্যগুলি বিশেষ করে নির্দিষ্ট কিছু অ্যান্টিবায়োটিক এবং সাইটোটক্সিক ড্রাগ থেকে পারদ অথবা ডাইঅক্সিন ড্রাগগুলো পরিচালনার সময় বা পোড়ানোর সময় পার্শ্ববর্তী পরিবেশে বিষ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- বর্জ্য পরিশোধন কার্যক্রম যেমন জীবানুনাশকরন (Disinfection), জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization) এর সময় রাসায়নিক বিকিরণ হতে পারে।
- চিকিৎসা বর্জ্য পোড়ানোর সময় পার্টিকুলেট ম্যাটারগুলো বাতাসে ছড়িয়ে বায়ুদূষণ সৃষ্টি করতে পারে।
- চিকিৎসা বর্জ্যের উন্মুক্ত জ্বলন বা ইনসিনারেটরে পোড়ানোর সময় তাপীয় জখম (Thermal injury) হতে পারে।
- তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হতে পারে।

তীক্ষ্ণ ও ধারালো বর্জ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি:
বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর আনুমানিক ১৬ বিলিয়ন ইনজেকশন ব্যবহৃত হয়। সূঁচ এবং সিরিঞ্জগুলো যে সবসময় নিরাপদে নিষ্পত্তি হয় তা নয়। ফলে এগুলো থেকে সংক্রমণ ছড়ানোর এবং আহত হওয়ার ঝুঁকি যেমন তৈরি হয়; তেমনি পুনর্ব্যবহারের ও সুযোগ তৈরি হয়। ইনজেকশন ডিভাইসগুলি পুনরায় ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাসকরণ প্রচেষ্টার কারণে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে দূষিত সূঁচ ও সিরিঞ্জগুলির সাথে ইনজেকশন ব্যবহার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এই অগ্রগতি সত্ত্বেও ২০১০ সালে ৩৩৮০০টি নতুন এইচআইভি সংক্রমণ, ১.৭ মিলিয়ন হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণ এবং ৩১৫০০০ হেপাটাইটিস-সি সংক্রমণের জন্য অনিরাপদ ইনজেকশনগুলি দায়ী ছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে সংক্রমিত রোগীর ব্যবহৃত সূঁচ থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অন্য ব্যক্তির মধ্যে এইচবিভি (HBV), এইচসিভি (HCV) এবং এইচআইভি (HIV) সংক্রমণের হার যথাক্রমে ৩০ শতাংশ, ১.৮ শতাংশ এবং ০.৩ শতাংশ।

অতিরিক্ত বিপদগুলো ঘটে আবর্জনা অপসারণের স্থানে আবর্জনা পরিচালনা করার সময় হাত দিয়ে বিপজ্জনক বর্জ্যগুলো বাছাই তথা আলাদা করা এবং খোঁজাখুঁজির সময়। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে বিশেষত নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে চিকিৎসা বর্জ্য পরিচালনার এটিই প্রচলিত

পদ্ধতি। ২০১৫ সালে ২৪ টি দেশ থেকে প্রাপ্ত নমুনার ওপর পরিচালিত WHO এবং UNICEF এর একটি যৌথ সমীক্ষায় দেখা যায় মাত্র ৫৮ শতাংশ ক্ষেত্রে এসব দেশে এ ধরনের চিকিৎসা বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

চিকিৎসা বর্জ্যের পরিবেশগত প্রভাব:

চিকিৎসা বর্জ্যগুলো পরিবেশে জীবাণু ও বিষাক্ত দূষণ ছড়িয়ে নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে-

- বর্জ্যগুলি সঠিকভাবে পরিশোধন না করে নিক্ষেপ করলে তা মাটির সঙ্গে সঙ্গে খাবার পানি বিশেষ করে ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির উৎসকে দূষিত করতে পারে, যদি বর্জ্য নিক্ষেপের আধার যথাযথভাবে নির্মাণ না করা হয়।
- রাসায়নিক জীবাণুনাশকগুলির সঙ্গে চিকিৎসা বর্জ্যের মিশ্রণের ফলে রাসায়নিক গুলি পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে যদি যথাযথভাবে সেগুলি পরিচালন, সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি না করা হয়।
- বর্জ্য পুড়িয়ে নিষ্পত্তি করা প্রচলিত এবং জনপ্রিয় পদ্ধতি। তবে অপর্যাপ্ত জ্বলন ও অনুপযুক্ত পদার্থের জ্বলন বাতাসে দূষণ ছড়িয়ে দিতে পারে এবং অবশিষ্টাংশ হিসাবে বিপুল পরিমাণ ছাই তৈরি হতে পারে। এটিও চিন্তার কারণ হতে পারে। ক্লোরিনযুক্ত পদার্থগুলি পোড়ালে ডাইঅক্সিন ও ফিউরান তৈরি করতে পারে। যা মানব কার্সিনোজেন ও ক্ষতিকর স্বাস্থ্যগত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। ভারী ধাতব অথবা উচ্চমাত্রার ধাতব ধারণকারী সামগ্রী পোড়ালে (বিশেষত সীসা, পারদ ও ক্যাডমিয়াম) পরিবেশে বিষাক্ত পদার্থ ছড়াতে পারে।
- বিশেষ গ্যাস ক্লিনিং যন্ত্রপাতি সজ্জিত অত্যাধুনিক ইনসিনারেটরে কেবলমাত্র ৮৫০-১১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পোড়ালে ডাইঅক্সিন ও ফিউরানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্গমন রক্ষা করা যায়। নতুবা তা বিপজ্জনক হয়।
- রাসায়নিক এবং বিপজ্জনক বর্জ্যের দূষণ কমানোর জন্য যেখানে ইনসিনারেশনের ব্যবস্থা নেই সেখানে অটোক্লেভিং, মাইক্রোওয়েভিং এবং স্টিম পরিশোধন ব্যবস্থা যৌথভাবে প্রয়োগ করলে পরিবেশের ক্ষতি কিছুটা কমানো যেতে পারে।

চিকিৎসা বর্জ্যের বৈশ্বিক চিত্র:

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে চিকিৎসা বর্জ্যের উৎপাদন একটি ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত সমস্যা। ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে নিষ্পত্তি ব্যবস্থার কড়াকড়ি প্রয়োগের কারণে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি নয়। কিন্তু এশিয়া-আফ্রিকার নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে এটি একটি মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে বিশ্বে প্রতিবছর ৫ থেকে ৯ মিলিয়ন টন চিকিৎসা বর্জ্য উৎপাদন হয়। এর মধ্যে ৮৫ শতাংশ বর্জ্য বিপজ্জনক নয় (Non-Hazardous)। বাকি ১৫ শতাংশ বিপজ্জনক (Hazardous) বর্জ্য। এগুলো সংক্রামক, বিষাক্ত অথবা তেজস্ক্রিয় হতে পারে। প্রতি বছর ১৬ বিলিয়ন ইঞ্জেকশন বর্জ্য সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন ২ মিলিয়ন নিডল (Niddle) বর্জ্য এবং প্রতি বছর ৮ লক্ষ নিডল স্টিক (N T05 H) বর্জ্য সৃষ্টি হয়। বিশ্বের নির্দিষ্ট কিছু দেশের চিকিৎসা বর্জ্যের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

Healthcare waste generation rates in selected countries

Serial	Country	HCW GR Kg/Bed/Day
1.	Egypt	1.03
2.	Mauritius	0.44
3.	Kazakhstan	5.34
4.	Turkey	4.55
5.	China	4.03
6.	Iran	3.04
7.	Japan	2.15
8.	Bangladesh	1.24
9.	USA	8.4
10.	Canada	8.2
11.	El Salvador	1.85
12.	Spain	4.4
13.	Italy	4
14.	Germany	3.6
15.	Netherland	1.7

Source: World Health Organization (WHO), 19 November, 2016.

চিকিৎসা বর্জ্য সংক্রান্ত বাংলাদেশের চিত্রঃ

চিকিৎসা বর্জ্য উৎপাদন ও এর বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে কতগুলি নিয়ামকের উপর। এগুলো হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থার ধরন, চিকিৎসা সুবিধা বিশেষায়নের মাত্রা, চিকিৎসা সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত আইটেমগুলোর পুনর্ব্যবহারের হার, মৌসুমী রোগের প্রকোপ, রোগীর চাপ, ডাক্তার-রোগীর অনুপাত এবং বেড সংখ্যার উপর।

স্বাস্থ্য বুলেটিন ২০১৯ অনুসারে বাংলাদেশের প্রতি ১৮৬০ জন জনসংখ্যার জন্য একটি বেড রয়েছে যা WHO নির্দেশিত আদর্শ মানের তুলনায় মাত্র ১৭ শতাংশ।

No of functional beds in the whole country (Bangladesh)

Types of HCF	Number of Beds	
	2010	2019
Public HCF,s	39341	54660
Private HCF,s	42237	91537
Total Bed	**81578**	**146197**

Source: Health Bulletin, 2010 & 2019

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরিচালিত একটি জরিপে দেখানো হয়েছে আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন হাসপাতালের বর্জ্য উৎপাদনের হার অপেক্ষাকৃত বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (BMCH) ও শমরিতায় হাসপাতাল বর্জ্য উৎপাদনের হার যথাক্রমে ০.৭৩ ও ০.৭৪ কেজি/ রোগী/ দিন। যেখানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (DMCH) এই হার ০.৬৭ কেজি/ রোগী/ দিন।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের চিকিৎসা বর্জ্য উৎপাদনের নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে ২০০৫-২০০৬ সালে ঢাকা শহরের ৬০টি হাসপাতালের ওপর পরিচালিত একটি জরিপ থেকে দেখা যায় গড় বর্জ্য উৎপাদনের হার ১.৯ কেজি/ বেড/ দিন। মূলত এই জরিপের উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের চিকিৎসা বর্জ্য উৎপাদনের প্রজেকশন করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এই হার ০.১৭ কেজি/ বেড/ দিন হলেই তা বিপজ্জনক।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা বর্জ্যের পরিমাণঃ

ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে MOHFW কর্তৃক প্রকাশিত 'Environmental Assessment and Action Plan' এ বলা হয়েছে বছরে যদি ৮ শতাংশ রোগী বৃদ্ধি পায় এবং গড় বর্জ্য উৎপাদনের উক্ত হার (১.৯ কেজি/ বেড/ দিন) যদি বজায় থাকে তবে MWM এর বৃদ্ধি ঘটবে ৫ শতাংশ এবং প্রকৃত চিকিৎসা বর্জ্য বৃদ্ধি পাবে ৩ শতাংশ। ফলে বছরে মোট গড় এর পরিমাণ হবে ৩৩২২১ টন। এর মধ্যে ৮২০৮ টন হবে বিপজ্জনক (২০০৯)। এই হার বজায় থাকলে ২০১৫ সালে তা হবে ৩৯৬৬৮ টন। এর মধ্যে ৯৮০১ টন হবে বিপজ্জনক বর্জ্য। উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানগুলো বলে দিচ্ছে বাংলাদেশ চিকিৎসা বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ এবং বৈশিষ্ট্য দুটিই বিপজ্জনক মাত্রায় উপনীত হয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তেমন অগ্রগতি ঘটেনি। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে ২০০৭ সালে National Implementation Committee (NICe) গঠনের মধ্য দিয়ে। একই সালে (২০০৭) Active Asian Association (জাপান) এর সহায়তায় দেশের প্রথম ইনসিনারেটর (Incinerator) স্থাপন করা হয়। ২০০৮ সালে চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা-২০০৮ জারি করা হয় এবং উক্ত বিধিমালায় বর্জ্যগুলো কে পৃথক করে আলাদা আলাদা রঙের বিনে (Bin) রাখার কোড নির্দেশ করা হয়। ২০০৮ সালে দেশে দ্বিতীয় ইনসিনারেটর স্থাপন করা হয় এবং MOHFW, DCC ও PRISM নামের একটি এনজিও যৌথভাবে চিকিৎসা বর্জ্য নিষ্পত্তির কার্যক্রম শুরু করে। এতে আর্থিক সহায়তা করছে WSP ও CIDA। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় হাসপাতাল থেকে বর্জ্য নিয়ে যাত্রাবাড়ির পার্শ্ববর্তী মাতুয়াইলে ডাম্পিং করা হয়। কিন্তু সিটি কর্পোরেশন দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পরে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আলাদা কোন কাঠামো এখনো তৈরি হয়নি। ফলে নতুন ডাম্পিং স্টেশন তৈরি হয়নি। আর পুরনো ডাম্পিং স্টেশনেও এখন আর জায়গা নেই। উল্লেখ্য যে PRISM যশোর ও সিলেটে চিকিৎসা বর্জ্য নিষ্পত্তির কাজ করছে। এছাড়াও Prodipon নামে আর একটি বেসরকারি সংস্থা খুলনাতে চিকিৎসা বর্জ্য নিষ্পত্তির কিছু কাজ করছে। ২০১০ সালে DMCH তাদের অভ্যন্তরীণ বর্জ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। আর বেসরকারি পর্যায়ে হলি ফ্যামিলি সহ আরো কিছু হাসপাতাল এসব কাজ করছে। কিন্তু বেশিরভাগ হাসপাতালেই নেই নিজস্ব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট।

অর্থাৎ বলা যায় দেশে বর্তমানে কিছু হাসপাতাল MWM কোড মানছে। কেউ আংশিক মানছে, আর কেউ কেউ কিছুই মেনে চলছে না। ফলে সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে চিকিৎসা বর্জ্য মিশে গিয়ে বিপদ বাড়াচ্ছে। আর এগুলো কাছে-দূরের নদী-নালা, নর্দমা ও সাধারণ কঠিন বর্জ্যের ভাগাড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে দূষণ ছড়াচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, যক্ষা, ডিপথেরিয়া; এমনকি এইডসের মতো মরণব্যাধির ঝুঁকি।

বদ্বীপ পরিকল্পনা ও বাংলাদেশের কৃষি

ড. সুরাইয়া পারভীন*

গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) কর্তৃক আয়োজিত ১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সর্বশেষ উক্তি ছিল "২০২১ সাল থেকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা করেছি, ২১০০ সাল পর্যন্ত এই বদ্বীপকে উন্নত করার জন্য ডেল্টা প্যান ২১০০ করা হয়েছে যাতে প্রজন্মর পর প্রজন্ম এই উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে পারে"। কোন একটি দেশের অগ্রগতি নির্ভর করে সে দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন। বর্তমান সরকার প্রনীত ডেল্টা প্যান তাঁর সুদুরপ্রসারী চিন্তার ফল। মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখেই তিনি এমন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা ভেবেছেন এবং তা বাস্তায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০ (বিডিপি ২১০০) হলো এমন একটি সময়াবদ্ধ শত বছরের পরিকল্পনা যা দীর্ঘমেয়াদি, একক এবং সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা। এই মহাপরিকল্পনায় মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য ও পানির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও প্রশমন করার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা আছে। এই পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের দরুন সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করে কৃষি, প্রাণি ও মৎস্যসম্পদ, বনায়ন, পানিসম্পদ, ভূমি, শিল্প ইত্যাদিকে গরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠু পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে। যথাযথ কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করায় ডেল্টা প্ল্যান ভূমিকা রাখবে।

ইউরোপের দেশ নেদারল্যান্ডসের আদলে গ্রহণ করা এই বদ্বীপ পরিকল্পনায় বৃহৎ পরিসরে তিনটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো: ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র দূর করা; ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা; ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন। যদিও এটি ১০০ বছরের পরিকল্পনা, আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ ৮০টি (৬৫টি ভৌত অবকাঠামো এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও গবেষণা বিষয়ক) প্রকল্প নেয়া হয়েছে যার মোট ব্যয় ৩ হাজার ৭০০ কোটি ডলার। কয়েক ধাপে ডেল্টা প্যান ২১০০ বাস্তবায়ন করা হবে। ২০৩১ সাল নাগাদ থাকবে প্রথম ধাপ। ২০৩১ থেকে ২০৫০ সাল নাগাদ পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ, এবং এরপর তৃতীয় ধাপ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২১০০ সাল। এরই মধ্যে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাজ শুরু করেছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত 'ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল'। ২০২০ সালের ১ জুলাই ১২ সদস্যের এই কাউন্সিল গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। বর্তমান সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীকে ডেল্টা কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর কাঙ্খিত লক্ষ্য হচ্ছে ৬টি। এগুলো হলো ১। বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ২। পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা ও নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা। ৩। সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। ৪। জলবায়ু এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং সেগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা। ৫। অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও সুশাসন গড়ে তোলা এবং ৬। ভূমি ও পানিসম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ পরিকল্পনায় ছয়টি হটস্পট নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে: উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রবন অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা এবং নগরাঞ্চল। এ অঞ্চল স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে বিভিন্ন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো যায় তা নিয়ে ভাবার সুযোগ রয়েছে।

*প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

পানি জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণির) একটি অতি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় উপাদান যার জন্য পানির অপর নাম জীবন। যেখানে পানির আস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় সাধারণত সেখানে কোন নির্দিষ্ট ইকোসিস্টেম স্থাপিত হয়ে জীব ও জড়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় মিশরীয় সভ্যতার সূচনা হয় নীলনদ ভিত্তিক কৃষি শুরুর মাধ্যমে। নীল নদ ভূমধ্যসাগরে মিশে যাওয়ার আগে উত্তর মিশরে তৈরি করেছে এক উর্বর বদ্বীপ। চারদিকে নদী আর সেই সাথে উত্তরে বদ্বীপ-কৃষি কাজের জন্য এক চমৎকার পরিবেশ। প্রতি বছর বন্যা হয় নীল নদে। আর বন্যার পর জমিতে জমে পলিমাটি। আর এই পলি জমা উর্বর মাটিতে প্রচুর ফসল ফলে। অপরদিকে হঠাৎ বন্যা হলে জমির পাকা ফসল নষ্ট হয়ে যায়। আবার অনেক দিন বৃষ্টি না হলে মাঠঘাট শুকিয়ে যায়। এতে ফসল ফলানো কঠিন হয়ে যায়। তাহলে পানিকে কৃষি কাজের সুবিধার্থে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় কি? কৃষি কাজের সুবিধার জন্য এবং বন্যার হাত থেকে ফসল বাঁচাতে বাঁধ দেওয়ার কথা চিন্তা করল মিশরীয়রা। বাঁধ দিলে বন্যা ঠেকানো যাবে আবার বর্ষার পানিও ধরে রাখা যাবে। আবার শুকনো মৌসুমে মাটি শুকিয়ে গেলে জমে থাকা পানি দিয়ে জমিতে সেচও দেওয়া যাবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, মূলত পানির সুব্যবস্থাপনার কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমেই সেই এলাকায় কৃষি কাজের উন্নয়ন হয় এবং সেখানে সভ্যতার সূচনা হয়।

পানির প্রাপ্যতার সাপেক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মায় বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ বা ফসল। সকল ফসলের পানির চাহিদা সমান নয়। এই সকল কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভাসও ভিন্ন। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত বা ধান। এই ধানের উৎপাদনের জন্য অন্য দানাদার ফসল অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পানির প্রয়োজন। বাংলাদেশের টেকসই কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের বিস্তৃত বিভিন্ন নদ-নদীর পানি সেচ কাজে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধনশীল বদ্বীপ প্রধান দেশ, যা প্রধানত পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও মেঘনা নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে আবৃত পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। তাই আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নদীর গরুত্ব অপরিসীম। এদেশে শতকরা ৮০ ভাগ এলাকা এই নদীগুলোর প্লাবন ভূমিতে অবস্থিত। এদেশের মানুষের জীবন, জীবিকা, কৃষি যা অর্থনীতির চালিকাশক্তি। বর্ষাকালে প্রচুর পানি ও পলি নদীগুলো দিয়ে বঙ্গোপসাগরে ধাবিত হয়। যার ফলে অসংখ্য চর গড়ে ওঠে। অন্যদিকে শুস্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম করায় অর্থাৎ পানি সম্পদ ব্যবস্থায় মানব সৃষ্ট পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ায় প্রাকৃতিক পানিচক্র বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এতে পানির গুণগত মান ও প্রাপ্ততা ক্রমশ কমে যাচ্ছে পাশাপাশি লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে। মিঠা পানির স্বল্পতা ক্রমে তীব্র হচ্ছে। নদীতে পানির পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তৃর্ণ এলাকা লবণাক্ততায় ভরে যাচ্ছে। এর ফলে কৃষি পরিবেশ হুমকির মুখে পতিত হয়ে বিভিন্ন শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়াও জীবজন্তুর বিলুপ্তি এবং প্রজাতি ধ্বংস হয়ে মানুষ স্বাস্থ্যঝুঁকি, অপুষ্টি, রোগব্যাধি, সামাজিক অবক্ষয় ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশে গত কয়েক দশক ধরে জীবন ধারণ, কৃষি, শিল্প ও অবকাঠামোর জন্য পানির ব্যবহার বেড়েছে। অন্যদিকে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু পানির প্রাপ্যতা হ্রাস পাচ্ছে এবং কৃষির জন্য পানি সম্পদ অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। শুস্ক মৌসুমে নদীতে অপর্যাপ্ত পানি প্রবাহ, বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনশীলতার ফলে কৃষির জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন বেড়েছে এবং ফসল ফলোনোর জন্য সেচের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খরা ও বন্যার তীব্রতা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা এবং পানির

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় পানিসম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার অত্যন্ত গরুত্বর্পূর্ণ। এ কারণে পরবর্তী ১০০ বছরের জন্য পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণে সরকার 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০ (বিডিপি ২১০০) প্রণয়ন করেছে। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে অভিযোজনশীল কৌশল বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি বৃহত্তর পানিসম্পদ খাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন শক্তিশালী করার নির্দেশনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর এনভায়নেমেন্ট অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর তথ্যমতে হিমালয় থেকে প্রতি বছর ১০০ টন পলি এসে সমুদ্রে পড়ে আর তা সমুদ্রের জোয়ার-ভাটায় এসে উপকূলে জমা হয়। হিমালয়কেন্দ্রিক নদীগুলো হয়ে যে পলি বাংলাদেশে আসে, তার তিন ভাগের এক ভাগ দেশের ভেতরের নদী ও নদীতীরে জড়ো হয়। এর ফলে পলিসমৃদ্ধ নতুন ভূমি জেগে ওঠে ও সীমিতহারে প্রাকৃতিক সম্পদসহ উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির বৃদ্ধি পায়। তাই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রয়োজন জলবায়ু উপযোগী কৃষি (climate resilient agriculture) এবং সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা। এর পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবছর কী পরিমাণ পানি উত্তোলন করলে পানির স্তরে ভারসাম্য বজায় থাকে এবং ভূগর্ভে পানির মজুদ ঠিক থাকে, তার একটা মানদণ্ড নির্ধারণ করে সবাইকে মানতে উৎসাহিত করতে হবে। ভূগর্ভের পানির উপর নির্ভরশীলতা কমাতে ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভের পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা ও পানির অন্যান্য উৎসসমূহ সংরক্ষণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাংলাদেশের কৃষিকে গরুত্ব দিয়ে নিম্নোক্ত উপায়ে কৃষি উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে:
১) আধুনিক, স্মার্ট ও টেকসই কৃষির (Sustainable Agriculture) উন্নয়নের জন্য অধিক জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করে Innovative কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ করা;
২) সময়োপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক ফসল বিন্যাস (Cropping Pattern) ব্যবহার ও বিশেষায়িত কৃষিতে (ভাসমান কৃষি ও নগর কৃষি) সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা, ফসলি জমির পরিমাণ, ফসলের উৎপাদন ও ফলন বৃদ্ধি করা;
৩) সঠিক মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাটিতে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, কৃষিজমির Topography, মৃত্তিকা ও পানির সহজলভ্যতাকে বিবেচনায় রেখে অঞ্চলভেদে অধিক ফলন ও মানসম্পন্ন বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা;
৪) পানির অপ্রতুলতাকে বিবেচনায় রেখে বর্হিবিশ্বের ন্যায় সেচকাজে ব্যবহৃত বৃষ্টির পানি সংরক্ষন করে খরা ও লবণাক্তপ্রবণ কৃষি জমিতে রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে কৃষকের চাহিদাভিত্তিক ফসল উৎপাদন করা;
৫) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে টেকসই কৃষির উন্নয়নে Climate Smart Agricultural Techniques এর ব্যবহার বাড়ানো যেমন: খরা, লবণাক্ততা ও জলবদ্ধতা সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন, কৃষিতে Nanotechnology এর প্রয়োগ;
৬) পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি যেমন: জমিতে বায়োচার প্রয়োগ, ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) পদ্ধতির ব্যবহার করা;
৭) জলবায়ুর বিরুপ প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য বসতবাড়ির আশেপাশে বাগান করা, সামাজিক বনায়ন ও কৃষি বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করা।

সেচ ও বৃষ্টিনির্ভর উভয় ধরনের কৃষিতে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য, পুষ্টি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। এই পানি ব্যবস্থাপনার আওতায় পানির অপচয় রোধ, দক্ষ সেচ পদ্ধতির ব্যবহার, পানি ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি, ইনোভেটিভ সেচ ব্যবস্থার প্রচলন, কৃষিতে পানির পুনর্ব্যবহার ইত্যাদি। দক্ষ সেচ ব্যবস্থা চালু করার জন্য কৃষকদের সক্ষমতা বাড়াতে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সে কারণে বাংলাদেশের জন্য সার্বিকভাবে কৃষি, মৎস্য, শিল্প, বনায়ন ইত্যাদিতে পানি ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনায় রেখে একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি পারিকল্পনা হিসেবে বদ্বীপ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ঈর্ষনীয় সাফল্য লাভের পর বাংলাদেশ এখন টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনের পথে যাত্রা শুরু করেছে। সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সরকার ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ কে একটি সমন্বয়ের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মাধ্যমে বাংলাদেশ হবে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী এক উন্নত বাংলাদেশ।

একটিই মাত্র পৃথিবী আমাদের

হাসান জাহিদ*

১৯৭২ সালে সুইডেনের রাজধানি স্টকহল্মে অনুষ্ঠিত হয়েছিল জাতিসংঘের মানব-পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলন। তখন স্লোগান ছিল "Only One Earth" বা আমাদের একটিই পৃথিবী। দীর্ঘ অর্ধ শতক পরে এই বছর (২০২২) আবার ফিরে এসেছে সেই স্লোগান বা থিম। ১৯৯২ সালে রিও আর্থ সম্মেলন ও পরবর্তী বছরগুলোতে অনেক কনফারেন্স/ট্রিটি ও কনফারেন্স অব পার্টিজ (কপ) অনুষ্ঠিত হয়, এবং সর্বশেষ কপ-২৬ অনুষ্ঠিত হয় স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে ২০২১ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর। এতো সম্মেলন/ট্রিটি আর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর সেই একই স্লোগান ফিরে আসার সোজা অর্থ হলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অবনয়ন পরিস্থিতি ও পৃথিবীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি; বরং অবনতি হয়েছে।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর মানবজাতি বেগার খেটেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের শঙ্কা নিয়ে, আর পৃথিবীর সার্বিক পরিবেশের অবনতি নিয়ে যে তিমিরে পড়ে ছিল মানবজাতি, এখনও সেই তিমিরেই আছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে, তাতে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্ফীত হয়ে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ক্ষতির শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। উষ্ণতা বৃদ্ধি মানবসৃষ্ট, প্রাকৃতিক কারসাজি নয়–এটি বিশ্বে আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। আর এই অমোঘ সত্যটাকে বহুবছর যাবত ধামাচাপা দেয়ার প্রচেষ্টায় রত ছিল বিশ্বের শিল্পোন্নত কতিপয় দেশ। শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উন্নত ও শিল্পায়িত বিশ্বের লাগামহীন কার্বন নিঃসরণের শিকার এখন গোটা বিশ্ব; কেননা উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে বরফ গলছে আর তা স্ফীত করে তুলছে সাগর-মহাসাগরকে যার কুফলে অধিক ভুগবে বিশ্বের দ্বীপরাষ্ট্রসহ নিম্নাঞ্চলীয় নাজুক ভৌগোলিক অবস্থানের দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশ।

প্যারিস সম্মেলনের লক্ষ্য অর্জনে নানা অ্যাকশন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কপ-২৬ (UN Climate Change Conference of the Parties, Glasgow, 31 October–13 November 2021) অনুষ্ঠিত হলো স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তিতে সই করা দেশগুলো বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রাক-শিল্পায়ন যুগের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি যেন না বাড়ে, তা নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা নিতে একমত হয়েছিল।

২০১৯ সালের শেষ দিকে করোনাভাইরাস মহামারির উত্থানের পর এটিই সশরীরে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন। চারটি লক্ষ্যকে এবারের সম্মেলনে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল।

-২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ শূন্যতে নামিয়ে আনতে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমনের মাত্রা ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা

-জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগকবলিত মানুষের জন্য বাস্তুতন্ত্র রক্ষা এবং পুনরুদ্ধার করা, প্রতিরক্ষা ও সতর্কতা ব্যবস্থা গ্রহণ, অবকাঠামো তৈরি ও কৃষি ব্যবস্থাকে স্থিতিস্থাপক করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা

-এসব কাজ সম্পাদনের জন্য প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল করার জন্য উন্নত দেশগুলোর ভূমিকা রাখা এবং- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করা

সম্মেলনে "গ্লোবাল গোল অন অ্যাডাপটেশন" সংক্রান্ত বৈশ্বিক লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য "গ্লাসগো-শার্ম এল-শেইখ ওয়ার্ক প্রোগ্রাম অন দি গ্লোবাল গোল অন অ্যাডাপটেশন" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা বাংলাদেশের ভবিষ্যত অ্যাডাপটেশন কার্যক্রমকে বেগবান করবে বলে বিভিন্ন মহল থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

ঘুরেফিরে সেই অ্যাডাপটেশনের বিষয়টিই বারবার উঠে আসছে। অ্যাডাপটেশনই বাংলাদেশের একমাত্র অপশন। বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে এতো মানুষ কোথায়-কীভাবে অ্যাডেপ্টেড হবে (তা নির্ভর করে অদূর ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে কতোটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ, তার ওপর)। অ্যাডেপশন বা খাপ খাইয়ে নিতে যে পরিকল্পনা, অর্থ ও প্রযুক্তির প্রয়োজন হবে, সেই বিষয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা আমাদের মিশন ও ভিশন হতে হবে। বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বা কার্বন নিঃসরণ ঘটিয়ে আজকের বিশ্বকে বিপর্যস্ত করায় বাংলাদেশের কোনো দায়ভাগ নেই। কিন্তু ভঙ্গুর ভৌগোলিক অবস্থান ও নিম্নাঞ্চল হওয়ায় বাংলাদেশ শিকার হচ্ছে উন্নত বিশ্বের লাগামহীন কার্বন নিঃসরণের কুফলে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের জন্য প্যারিস সম্মেলনের চুক্তি সুফল বয়ে আনত বিগত ছয় বছরে। দৃশ্যত তা যখন হয়নি, তখন সদ্য সমাপ্ত কপ-২৬ সামিট তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমিয়ে আনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা বাস্তবায়িত হয় কিনা, এখন দেখার বিষয়। যদিও ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমানোর উদ্যোগ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধে যথেষ্ট নয়; তবু সেটা মন্দের ভালো।

২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, এবারের সম্মেলনে এটিকে আরও জোরদার করার কোনো বিকল্প ছিল না। তা সত্ত্বেও সম্মেলনে যুগান্তকারী কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

*কথাশিল্পী, পরিবেশ লেখক, সার্টিফায়েড মেম্বার, ইকো-ক্যানেডা, ক্যালগেরি, আলবার্টা

বিশ্বের প্রভাবশালী ও সমৃদ্ধ দেশগুলোর কাছ থেকে কার্বন কমানোর জোরালো ও সুস্পষ্ট কোনো প্রতিশ্রুতি কিন্তু এই সম্মেলনেও পাওয়া যায়নি। প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এই সম্মেলনে একটি রুল বুক প্রণীত হয়েছে। আর এই রুল বুকের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোর

কপ-২৬ এর প্রাক্কালে আইপিসিসি (The Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) ও ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আইইএ) জোর দিয়ে বলেছিল, ব্যাপক হারে কার্বন নিঃসরণ কমাতে দেশগুলোকে নতুন ও উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। কপে কিছুটা হলেও তার প্রতিফলন দেখা গেছে। প্রধান কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোকে সম্মেলন সমাপ্তির দিন থেকে ১২ মাসের মধ্যে নতুন পরিকল্পনা জমা দিতে হবে। জাতিসংঘকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে তাদের নীতি ও পরিকল্পনা কীভাবে প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য পূরণ করবে।

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, একমাত্র আইপিসিসি এর জন্মলগ্ন থেকে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এই প্যানেলের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল বিভিন্ন বছরের ও সময়ের রিপোর্ট-এর সুপারিশগুলো যদি উন্নত দেশ আমলে আনত, আজকে বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের চূড়ান্ত নেতিবাচক প্রভাব পড়ত না। বরং এক ধরনের বিনাশী প্রচারণা ছিল তার উল্টোপিঠে যে, জলবায়ু পরিবর্তন মানবসৃষ্ট নয়!

অনস্বীকার্য যে, শিল্পবিপ্লবের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী ও পরাশক্তির দেশগুলো বিলাসিতায় ও আরাম-আয়েশে থেকে, পৃথিবীর সিংহভাগ ভূখণ্ডকে চরম বিপদের মুখে ফেলেছে জলবায়ু পরিবর্তন নামের দানবের জন্ম দিয়ে তারা জেগে থেকেও ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল। তারা জানত, এই পৃথিবীটা আমাদের নয়; আমরা শুধুমাত্র একে ধার নিয়েছি আগামী প্রজন্মের কাছ থেকে।

সম্মেলন ব্যর্থ ধরে নিলে বলতে হয় যে, ব্যর্থতা দিয়ে যার শুরু তার ব্যর্থতার দায়ভাগ বাংলাদেশের নয়। মাদ্রিদ সম্মেলন শেষ হয়েছিল 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' দিয়ে, যার অর্থ ছিল বাংলাদেশ ক্ষতিপূরণ আদায়ে ওয়ারশো ইন্টারন্যাশনালের যে দীর্ঘ সময় ও জটিল ম্যাকানিজমের মধ্য দিয়ে যাবে, সেই সময় ও পরিশ্রমে বাংলাদেশ নিজস্ব উদ্যোগে অনেক এগিয়ে যেতে পারে অবকাঠামো উন্নয়ন ও অ্যাডেপ্টেশনের দিকে। সেইক্ষেত্রে প্রয়োজন ফান্ড ও ক্ষতিপূরণ।

বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশবাদী সুইডেনের গ্রেটা থুনবার্গ কপ-২৬কে ব্যর্থ বলে আখ্যায়িত করে গ্লাসগোতে শত শত মানুষের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিশ্বজুড়ে দেড় হাজারেরও বেশি স্থানে জলবায়ু কর্মীরা রাস্তায় নেমেছিলেন। বিশ্বনেতাদের কাছ থেকে পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধিকারী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ব্যাপকভাবে হ্রাস করার জন্য আরও উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ নিশ্চিত করার দাবি তোলেন তারা।

সম্মেলন শুরুর আগেই ইউনাইটেড ন্যাশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ জানিয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কার্বন নিঃসরন বিষয়ক যে পরিকল্পনা (এনডিসি) জমা দিয়েছে সেটি অনুযায়ী, বিশ্বের তাপমাত্রা দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরিবর্তে দুই দশমিক সাত ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে যা হবে মানবজাতির জন্য ভয়ানক।

কপ-২৬ এর সভাপতি অলোক শর্মা সম্প্রতি বলেন, "দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বিশ্বের ৭০ কোটি মানুষ চরম দাবদাহের শিকার হবে। দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে দুইশ' কোটিতে।"

সম্মেলনে প্রথমবারের মতো ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্পোন্নত দেশের জন্য তহবিলের পরিমাণ ১৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে উন্নীত করে ৪৩১ মিলিয়ন ডলার করা হয়েছে। বিষয়টা এভাবে ভাবা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের জন্য একটা অন্যতম অপশন হলো বিভিন্ন কপ সম্মেলনে যে ফান্ড ঘোষণা করা হয়, তার থেকে সামান্য কিছু প্রাপ্তিযোগ।

বাংলাদেশের একমাত্র প্রাপ্তি হলো আর্থিক অনুদানের অপেক্ষায় থাকা। সেটা পাওয়া যাবে; তবে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। আবারও দ্বারস্থ হওয়া, নিজেদের বিপন্নতাকে তুলে ধরা ও নেগোশিয়েশন চালিয়ে যাওয়া। এগুলো কি খুব ক্লান্তিকর নয়? অভ্যন্তরীণ পরিবেশদূষণ ও প্রাতিবেশিক অবনয়নের জন্য ধরে নিলাম আমরাই না হয় দায়ী, কিন্তু বৈশ্বিক অবনতির জন্য তো আমরা দায়ী নই, অথচ বৈশ্বিক বিপর্যয়ের ধকল যাবে আমাদের ওপর দিয়ে। এটা বারবার কেন তাদের কাছে বিস্তর কাগজপত্র/প্রমাণাদি নিয়ে হাজির হয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে?

একটা সম্মেলনে কোনো প্রতিশ্রুতি থাকলে, সেটার অপেক্ষায় বাংলাদেশকে বসে থাকতে হয়। পরের সম্মেলন পর্যন্ত সেটা প্রাপ্তির জন্য নানা দেনদরবার আমাদেরকে করতে হয়। দেনদরবার বলতে আসলে এখানে একধরনের ধকলের বিষয় থাকে, একটা এফোর্ট দিতে হয়। বাংলাদেশের পক্ষে সেটা কঠিন কাজ, আমাদেরকে সর্বক্ষণ তাড়িয়ে বেড়ায় ঘরের সমস্যা। তবুও আমাদেরকে এই কাজটি করতে হবে সাফল্যের সাথে।

আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইএ) বলছে এশিয়ার দেশগুলো বিশ্বের শতকরা ৭৫ ভাগ কয়লা ব্যবহার করে। অথচ জি-২০ দেশসমূহ বিশ্বের ৮০ ভাগ কার্বন নিঃসরণ করে। ইমিশন কাট করার বিষয়ে তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না থাকলেও তারা এখন উদ্বিগ্ন কয়লাজনিত নিঃসরণ নিয়ে! অংক পরীক্ষার দিন কি ইংরেজি পড়ে গেলে পরীক্ষায় পাস করা যাবে! উন্নত বিশ্ব আমাদেরকে এরকম প্রস্তুতি নিতেই কি বলছে না?

সূত্রমতে, ২০২১ সালের জুলাই পর্যন্ত, বিশ্বের বিদ্যমান কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাঁচ ভাগের চার ভাগই রয়েছে চিন, ভারত, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক ও বাংলাদেশে।

বাংলাদেশ এই সম্মেলনে বনভূমি উজাড় রোধকল্পে একটি আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ, যার মাধ্যমে দেশে বনভূমি ধ্বংস রোধ করা যাবে বলে আশা করা যায়। তবে বাংলাদেশ মিথেন কমানো সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে যোগ দেয়নি।

জলবায়ু সম্মেলন সেই শেয়াল পণ্ডিত ও কুমিরের সাতটা বাচ্চার কথাই আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়। মা কুমির তার সাত বাচ্চাকে বিদ্যায় দিগ্‌গজ করার জন্য শেয়াল পণ্ডিতের হাতে তুলে দেয়। শেয়াল একে একে ছয় বাচ্চাকে খেয়ে হজম করে ফেলে। একদিন মা কুমির সাত বাচ্চাকে দেখতে চাইলে শেয়াল একটা বাচ্চাকে সাতবার গর্ত থেকে উঠিয়ে-নামিয়ে সাতবার দেখায়। পশ্চিমা বিশ্বের আচরণ আমাদের মতো দেশগুলোর প্রতি অনেকটা শেয়ালের চালাকির মতো। কিছু বেনেফিট তো আমাদের হবেই। তবে তা অপ্রতুল। আমরা দেখতে চাই র‍্যাডিকেল কিছু, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে ভিজিবল কিছু আমাদেরকে পেতে হবে। সম্মেলনের মাইক্রোফোনের ভেতর দিয়ে ভেসে আসা শব্দ আমাদের কর্ণকুহর আর ধারণ করতে পারছে না। আমরা দেখতে চাই কোটি কোটি মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাস্তু আর নির্মল প্রকৃতি।

জলবায়ু পরিবর্তন ও তার কুপ্রভাব, ভবিষ্যত পৃথিবীর জন্য কেন হুমকি হয়ে উঠল, কীভাবে হলো, আগামী পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য রাখতে কী করে যেতে হবে বর্তমান পৃথিবীকে–এসব এখন বিপন্ন বিশ্ববাসীর সামনে ক্রসওয়ার্ড পাজল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনস্বীকার্য যে, শিল্পবিপ্লবের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী ও পরাশক্তির দেশগুলো বিলাসিতায় ও আরাম-আয়েশে থেকে, পৃথিবীর সিংহভাগ ভূখণ্ডকে চরম বিপদের মুখে ফেলেছে জলবায়ু পরিবর্তন নামের দানবের জন্ম দিয়ে। তারা জেগে থেকেও ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল। তারা জানত, এই পৃথিবীটা আমাদের নয়; আমরা শুধুমাত্র একে ধার নিয়েছি আগামী প্রজন্মের কাছ থেকে: `We do not inherit the Earth from our ancestors; we borrow it from our children.'Cree Indian prophecy

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর

ফরিদ আহমদ*

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে দ্রুত শিল্পায়ন হচ্ছে। শিল্পায়নের সাথে পরিবেশের একটি নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। শিল্পায়নের সাথে সাথে পরিবেশের দূষণও বৃদ্ধি পায়। তাই পরিবেশ দূষণকে উন্নয়নের প্রসব ব্যথাও বলা চলে। শিল্পায়ন যেমন প্রয়োজন, পরিবেশ সংরক্ষণও তেমন প্রয়োজন। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশ সংরক্ষণই পরিবেশ অধিদপ্তরের মূল দায়িত্ব ।

পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের অধীন একটি অধিদপ্তর। একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এ অধিদপ্তর। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গ্রেড ১ ধারী একজন কর্মকর্তা হয়ে থাকেন। এ অধিদপ্তরে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক, সদরদপ্তর ও বিভাগীয় পর্যায়ে রয়েছেন পরিচালক, জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বে আছেন উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা। সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক/সিনিয়র কেমিস্ট ছাড়াও বিভিন্ন সাপোর্ট ষ্টাফ রয়েছেন ।

পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালিত হয় কয়েকটি আইন ও বিধিমালা দ্বারা। পরিবেশ অধিদপ্তরের মূল আইন পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০)। এছাড়াও রয়েছে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৯, পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ৯টি বিধিমালা রয়েছে:

১. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭
২. বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২
৩. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬
৪. শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬
৫. চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮
৬. বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১
৭. ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪
৮. ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১
৯. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১

এ আইন ও বিধিমালা দ্বারাই পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় ।

প্রাথমিকভাবে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিবেশের উপর প্রভার বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে: সবুজ, কমলা- ক, কমলা- খ, লাল । সবুজ শ্রেণীর শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রথমে অবস্থানগত এবং তারপর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। তবে, কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের আবেদনক্রমে এবং মহাপরিচালক যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে তিনি উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান ব্যতিরেকে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে পারেন। পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা যথাযথ ফি-সহ নির্ধারিত ফর্মে বিভাগ/জেলা কার্যালয়ে আবেদন করেন। ছাড়পত্র প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সমূহ:

- নির্ধারিত ফর্মে আবেদন।
- শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।
- প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (আইইই) প্রতিবেদন (প্রস্তাবিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে) অথবা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদন (বিদ্যমান প্রকল্পের ক্ষেত্রে)।
- উৎপন্ন দ্রব্যের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম (Pollution Points উল্লেখপূর্বক)
- (ক) শিল্পপ্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান (বর্জ পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত)।
  (খ) শিল্পপ্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা।

*পরিচালক (উপসচিব), পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ

- বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) এর নকশা (কেবল প্রস্তাবিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অথবা বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) এর নকশাসহ উহার কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাদি।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র (ওয়ার্ড কমিশনার/চেয়ারম্যান কর্তৃক)।
- পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত জরুরী পরিকল্পনাসহ দূষণের প্রকোপ হ্রাসকরণ পরিকল্পনা।
- পুনঃস্থাপন, পূনর্বাসন, পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- লোকেশন ম্যাপ (চৌহদ্দি এবং উল্লেখযোগ্য স্থাপনা, কারখানা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও তার লে-আউট প্ল্যান এর তথ্যাদি দূরত্বসহ অবস্থান)।
- ট্রেড লাইসেন্স।
- হালনাগাদ আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (টাকার পরিমাণসহ টিআএন, ভ্যাট সার্টিফিকেট)।
- দাগ, খতিয়ান উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ মৌজা ম্যাপ (দাগ নম্বর চিহ্নিতকরণসহ)
- জায়গার মালিকানা দলিল (মিউটেশন পর্চা/ভাড়ার চুক্তিপত্র)।
- বিনিয়োগ বোর্ড/বিসিক এর নিবন্ধনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তারিখ উল্লেখপূর্বক বিনিয়োগ বোর্ড/ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কর্তৃক প্রদেয় প্রত্যয়নপত্র।

মূলত দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্যই যে প্রতিষ্ঠানের জন্য যে কাগজপত্র প্রয়োজন তা চাওয়া হয়। অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তাবিত স্থানটি যথাযথ কিনা তা বিবেচনায় নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি শুরু করার পূর্বে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সে নির্দেশনা অবস্থানগত ছাড়পত্রে উল্লেখ থাকে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবস্থানগত ছাড়পত্র নেয়ার পর EIA এর TOR ও প্রয়োজনীয় নকশা পরিবেশ অধিদপ্তর হতে অনুমোদন করে নিতে হয়। অবস্থানগত ছাড়ত্রের EIA এর TOR ও এর নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। সকল ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ দূষণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। এভাবে ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমেই পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন করা হয় ।

ছাড়পত্র নবায়নের মাধ্যমেও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সবুজ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) বছর পর পর এবং অন্যান্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রতি বছর নবায়ন করতে হয়। প্রতিবার নবায়নের ক্ষেত্রে পরিদর্শনের বিধান রয়েছে। তাছাড়া ছাড়পত্র নবায়নের ক্ষেত্রে গবেষণাগার হতে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট অবশ্যই সংগ্রহ করে আবেদনের সাথে জমা দিতে হয়। যেমন ধরা যাক, যেসব প্রতিষ্ঠান তরল বর্জ্য নিঃসরণ করে তাদেরকে অবশ্যই ছাড়পত্রের আবেদনের সাথে পূর্বের বছরের পানির গুনগতমান এর রিপোর্ট (বছরে ৪ টি রিপোর্ট) পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত ল্যাব হতে সংগ্রহ করে জমা প্রদান করতে হয় (ল্যাব স্যাম্পল কালেকসন করে রিপোর্ট তৈরি করে)। সেই রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্যারামিটার মানমাত্রার বাইরে থাকলে তাকে ছাড়পত্র নবায়ন প্রদান করা হয় না এবং যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়। তরল বর্জ্য নিঃসরনের ক্ষেত্রে (Zero Liquid Discharge-ZLD) প্যান আছে কিনা / বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তাও দেখা হয়। একইভাবে বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণের ক্ষেত্রেও ল্যাব রিপোর্ট জমা নেয়া হয় । ছাড়পত্রের কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তা সংশোধন না করা পযন্ত নবায়ন কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয় বা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকরী হাতিয়ার হলো এনফোর্সমেন্ট। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিবেশ দূষণকারী প্রতিষ্ঠানকে শুনানির সুযোগ দিয়ে ক্ষতিপূরণ ধার্য ও আদায় করে থাকেন এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করেন। ল্যাব থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট বা জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বা পরিদর্শনের ভিত্তিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের আরেকটি ব্যবস্থা হলো মোবাইল কোর্ট। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ মোবাইল কোর্টের তফসিলভূক্ত একটি আইন। মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৬(২) এর আলোকে তফসিলভূক্ত আইনের সকল বিধিমালাও তফসিলভূক্ত। তাই পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকেন ।

পরিবেশ দূষণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালত/স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করার সুযোগ রয়েছে। পরিবেশ অধিপ্তর বা পরিবেশ দূষণের শিকার যে কোন ব্যক্তি থানার মাধ্যমে বা সরাসরি উল্লিখিত আদালতে মামলা করতে পারেন। এভাবে মামলার মাধ্যমে বিচারিক প্রক্রিয়ায় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় ।

পরিবেশ অধিদপ্তর নিজস্ব উদ্যোগে কিংবা অভিযোগকারীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি ও পরিদর্শনের মাধ্যমে যথাযথ নির্দেশনা দিয়ে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমও গ্রহণ করে থাকে। লিফলেট বিতরণ, বিলবোর্ড স্থাপন, ইলেক্ট্রনিক/প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমেও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নেয়া হয় ।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা রক্ষার জন্য জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা প্রয়োজন। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইন ও বিধিমালায় কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ধারা ১২ লংঘনের অপরাধকে কে মোবাইল কোর্টের তফশিলভুক্ত করা যায়। সকল জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় নেই। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা রাখার জন্য সকল জেলায় এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পঘন উপজেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় থাকা প্রয়োজন। সকল বিভাগে ল্যাব স্থাপন করা প্রয়োজন। জনবল বৃদ্ধিসহ লজিসটিকস সাপোর্টও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ।

হাওর অর্থনীতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোহাম্মদ এমরান হোসেন*

ভূতাত্ত্বিকগণ মনে করেন হাওরাঞ্চল পূর্বে সাগরের বিশাল জলরাশি ছিল। সাগর আস্তে আস্তে দক্ষিণে সরে গিয়েছে এবং কালের বির্বতনে তা হাওরের রূপ লাভ করেছে। ভাষাবিদগণ 'হাওর' শব্দকে সংস্কৃত 'সাগর' শব্দের অপভ্রংশ বলে অভিমত প্রদান করেছেন। 'সাগর' শব্দ লোকমুখে বির্বতিত হয়ে 'হাওর'(সাগর>সাওর>হাওর) হয়েছে। গাঙ্গেয় অববাহিকায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ আমাদের এ প্রিয় বাংলাদেশ। উর্বর পলল-সমৃদ্ধ ছোট্ট এই দেশটি ভু-বৈচিত্র্য ও রূপবৈচিত্র্যের বিচারে পৃথিবীতে এক অনন্য দেশ। বাংলাদে যেমন পৃথিবীর সর্বোচ্চ নদী বিধৌত সমতল ভূমির দেশ তেমনি এদেশে রয়েছে প্লাইস্টোসিনকালের বিভিন্ন গড় অঞ্চল, পাহাড় ও সুবিশাল সমুদ্র উপকূল।

বাংলাদেশের ভু-বৈচিত্র্যের এক অনন্য স্বতন্ত্র দিক হচ্ছে হাওর। বাংলাদেশের বিশাল অংশ হাওর এলাকা হিসেবে পরিচিত। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অর্থাৎ এ সাতটি জেলার প্রায় ৮.৫৮ লক্ষ হেক্টর জমি নিয়ে হাওর অঞ্চল গঠিত। যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশে ছোট-বড় ৪১৪টি হাওর, জলাশয় ও জলাভূমি রয়েছে। জলমহাল রয়েছে ২৮ হাজার। বিল রয়েছে ছয় হাজার ৩০০। ভাটির দেশ হিসাবে পরিচিত সুনামগঞ্জে রয়েছে ১৩৩টি, সিলেটে ৪৩টি, হবিগঞ্জে ৩৮টি, মৌলভীবাজারে ৪টি, নেত্রকোনায় ৮০টি, কিশোরগঞ্জ এ ১২২টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৩টি হাওর রয়েছে। সর্বোপরি সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হাওর-বাওড়, বিল-ঝিল নিয়ে গঠিত হাওরাঞ্চল বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে হাওরের রয়েছে বিশাল প্রভাব। হাওরপাড়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবন হাওর প্রভাবিত। এ অঞ্চলের মানুষের চিন্তা-চেতনা, মেধা-মনন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনৈতিক প্রাণ চাঞ্চল্য সবকিছু হাওর কেন্দ্রিক।হাওরে বসবাসরত মানুষজন প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করেই বেঁচে আছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে ঝড়, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত, আগাম বন্যা (Flash flood) হাওরের বেশিরভাগ ঘর-বাড়ি ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। 'এ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। এক গবেষণায় দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০৫০ সাল নাগাদ হাওর অঞ্চলে পানির উচ্চতা প্রাক-র্বষা মৌসুমে দশমিক ৩ থেকে দশমিক ৬ মিটার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। সুতরাং সময় থাকতেই হাওরে আনতে হবে পরিকল্পিত কর্মসূচি, যে কর্মসূচি হবে উন্নত পৃথিবীর পানিবেষ্টিত জনপদের মতো জীবনবান্ধব। এ এলাকার জীবন ব্যবস্থায় যার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি কেবলই পানি আর পানি, তখন পানি সহায়ক কর্মকাণ্ড যেমন ধান চাষ, মৎস্য চাষ, হাঁস চাষ, পানিফলের চাষ, নৌকায় যোগাযোগ ইত্যাদি এই অঞ্চলের মূল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। সময় পরিক্রমায় জীবিকার ধরণেও পরিবর্তন হয়।

হাওর এলাকার এসমস্ত দিক চিন্তা করে হাওর কেন্দ্রিক উন্নয়ন ভাবনা প্রথম শুরু হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমে। হাওর ও জলাভূমি এলাকার জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়; কিন্তু হাওর এলাকার সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের যে স্বপ্ন নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৯৮২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বোর্ডটি বিলুপ্ত করা হয়। হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়ে। হাওর এলাকার মানুষ শিক্ষা-দীক্ষা থেকে শুরু করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পিছিয়ে পড়ে। জাতির পিতার পর হাওর এলাকায় উন্নয়নের সুবাতাস আবার আসতে থাকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে। ১৯৯৮ সালের ৩ অক্টোবর কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইনে এক জনসভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাওর ও জলাভূমি এলাকার উন্নয়নে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালের ১০ জানুয়ারি দুইটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড' এবং বোর্ডের 'কার্যনির্বাহী কমিটি' গঠন করা হয়। পরে হাওর ও জলাভূমি এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ১৭ নভেম্বর হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে অধিদপ্তর ঘোষণার নির্দেশ প্রদান করেন। হাওর এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নয়নের কথা বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় হাওর এলাকার জনজীবন, জীবিকা, পরিবেশ-প্রতিবেশসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য ২০১২ থেকে ২০৩২ সাল পযন্ত মোট ২০ বছর মেয়াদি একটি হাওর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

'মাছে ভাতে বাঙালি' আজন্ম কালের প্রবাদ। দেশের মৎস্য সম্পদের একটি বড় অংশ হাওরেই উৎপাদিত হয়। দেশের মোট মাছের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ জোগান দেয় হাওর। দেড় কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা মৎস্য সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। ১৩ লাখ মানুষ সরাসরি মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল। সুনামগঞ্জ জেলায় ৯২০০০ নিবন্ধিত এবং প্রায় ৩০০০০ অনিবন্ধিত মৎস্যজীবী রয়েছে। রপ্তানি খাতের মধ্যে মৎস্য অন্যতম। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বেলায় মৎস্য খাত দ্বিতীয়। হাওরাঞ্চলের জলরাশিতে পাওয়া যায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নানা জাতের মাছ যেমন- কৈ, সরপুঁটি, পুঁটি, তিতপুঁটি, কাতলা, মাগুর, খৈলসা, বাঁশপাতা, আইড়, টেংরা, বাইম, চিতল, ভেদা, পাবদা, গজার, শোল, মহাশোল, চাপিলা, কাকিলা, বোয়াল, মৃগেল, রুই, কালবাউস প্রভৃতি। মৎস বিজ্ঞানীদের ভাষায়, হাওর হলো মাদার ফিসারি। দেশের ২৬০

*পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়

প্রজাতির মাছ এর মধ্যে এই মাদার ফিসারিতে মিঠা পানির মাছ আছে প্রায় ১৫০ প্রজাতির। যার মধ্যে প্রাকৃতিক এবং মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে বিলুপ্তির পথে প্রায় ৬০টি প্রজাতি যেমন তিলা শোল, পাঙাশ, রিটা, মহাশোলসহ অন্যান্য মাছ। সিলেট বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তরের মতে, এই বিভাগের বিভিন্ন উৎস যেমন হাওর, জলাশয়, পুকুর ইত্যাদি থেকে প্রতি বছর ১,২৩,৮৩৫.৩৬ টন মাছ আহরণ করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের মতে, সুনামগঞ্জ জেলায় প্রতিবছর ৮৯ হাজার টন মাছ উৎপাদিত হয়। জেলার স্থানীয় চাহিদা ৫৪ হাজার টন। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকে ৩৫ হাজার টন। হাওর অঞ্চলে গুণগত মানসম্পন্ন মাছের পোনার অভাবে অনেক সময়েই মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়। এক্ষেত্রে মানসম্পন্ন মাছের পোনা সরবরাহের মাধ্যমে Captured Culture এবং Open Culture এর ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে। প্রজনন মওসুমে মৎস্য প্রজাতি রক্ষা, মাছের বিস্তার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ২/৩ মাস (এপ্রিল-জুন) মাছ ধরা সম্পূর্ণ বন্ধ করাসহ নিবন্ধিত মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ/ভিজিডি প্রদান করতে হবে যাতে তারা মা মাছ ধরা বন্ধ রাখে। মাছের প্রাকৃতিক বিচরণের পথগুলো চালু রাখতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই তা বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। এতে করে হাওরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু মাছ চাষ হাওর অঞ্চলের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উৎস, সেহেতু মৎস্য চাষকে আমাদের বণ্ডমুখীকরণ করতে হবে। মৎস্যজীবীরা যেন মাছের ন্যায্য মূল্য পায় সে জন্য কাওরানবাজার সহ দেশের বড় বড় চেইন শপগুলোতে সরাসরি হাওরের মাছ সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাছের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাওর এলাকাতে কোল্ড স্টোরেজ, ফুড প্রসেসিং কারখানা, একাধিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, ভূমিহীন জনবসতির এক অপূর্ব কর্মসংস্থানের পথ হলো হাওরের মাছ আহরণ এবং তা থেকে তৈরি শুঁটকি মাছের ঘেরে নিজের শ্রম বিক্রি। এসব শুকনো মাছের শুঁটকি অনেকের কাছে প্রিয় খাদ্য তালিকার অংশবিশেষ, যা দেশি বাজার ছেড়ে আন্তর্জাতিক বাজারে বিস্তৃত।

মৎস্যজীবীদের আর্থিক সক্ষমতার তুলনায় জলমহালের ইজারামূল্য অধিক সেহেতু বিদ্যমান ইজারা পদ্ধতির পরিবর্তে কার্ডধারী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমিতির অনুকূলে টোকেন মূল্যে জলমহাল ইজারা প্রদান করা যেতে পারে। খাজনা আদায় বিষয়টি গৌণ করে জৈবিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে মৎস্য বিভাগের জৈবিক ব্যবস্থা বিষয়ক প্রত্যয়ন ছাড়া জলমহাল লীজ নবায়ন না করা। সরকারের নীতিমালা, ২০০৯ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ফলে মৎস্যজীবীগণ পূর্বের চেয়ে জলমহাল ইজারা গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন।

বিশেষ করে জলমহালের ইজারা প্রক্রিয়ায় কোন অমৎস্যজীবী অংশগ্রহণ করতে পারেন না । কিন্তু বড় বড় জলমহালের ইজারা মূল্য অধিকাংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সামর্থের বাহিরে হওয়ায় মৎস্যজীবীগণ জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে স্থানীয় দাদন ব্যবসায়ী/ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করতে হয়। ফলে মৎস্যজীবীগণ আহরিত মৎস্যের প্রকৃত অংশীজন হতে পারছেন না। ফলে মৎস্যজীবীগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাঙ্খিত উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে জলমহাল ব্যবস্থাপনায় রাখার জন্য নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির বিপরীতে কম সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। প্রয়োজনে মৎস্য আহরণ মৌসুমে ঋণ আদায়ের জন্য তৃতীয় পক্ষ/এনজিওকে সম্পৃক্ত করে পাইলটিং আকারে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

হাকালুকি হাওর

বাংলাদেশের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ১৬% আসে হাওর থেকে যার মূল্য জাতীয় আয়ের প্রায় ৬-৮ ভাগ এবং মোট উৎপাদিত ফসলের ৭৯.৫% হচ্ছে বোরো ধান। সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে, জেলায় গত ২০১৭ সালের বোরো মৌসুমে প্রায় দুই লাখ ২৩ হাজার ৮৭ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছিল। ফলনও হয়েছিল ভালো। প্রায় আট লাখ ৪৩ হাজার টন চাল পাওয়া যেতো এ পরিমাণ ধান থেকে। যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৩৪ হাজার ১৬ কোটি টাকা। কিন্তু গত ২৯ মার্চ ২০১৭ এর পাহাড়ি ঢল ও বর্ষণে বাঁধ ভেঙে জেলার সবগুলো হাওর তলিয়ে গেছে। সরকারি হিসাবেই ফসলের ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৯০ ভাগ। যার আর্থিক ক্ষতি প্রায় ২২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। শুধু ধানই নয়, এ অকাল বর্ষণ ও ঢলে সুনামগঞ্জ জেলার সবজিও নষ্ট হয় যার আর্থিক ক্ষতি প্রায় ৪০ লাখ টাকা। জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, সুনামগঞ্জে আমন-বোরো মিলিয়ে প্রতিবছর প্রায় ৯ লাখ ৭৬ হাজার ১৯৭ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে জেলার চাহিদা চার লাখ ১৪ হাজার ৬১৫ টন। প্রতিবছর উদ্বৃত্ত থাকে প্রায় পাঁচ লাখ ৪০ হাজার ৩৪৯ টন। গত ২৯ মার্চ ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় জনজীবনে মানবিক বিপর্যের সৃষ্টি হয়। সরকার তাৎণিকভাবে মানবিক বিপর্যয় রোধে ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে পরবর্তী ফসল সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত ১৬৮০০০ পরিবারকে মাসিক ৩০ কেজি করে খাদ্য শস্যসহ ৫০০ টাকা সহায়তা করার পাশাপাশি ১৫০০০০ পরিবারকে ৮ কেজি করে খাদ্য শস্য প্রদান করে। এ কর্মসূচিতে সরকারের প্রায় ৬১৬৮০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য এবং ১০০ কোটি ৮০ লক্ষ ব্যয় হয়। যার ফলে মানবিক বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়। মার্চ ২০১৭ সালের আগাম বন্যা এবং পাহাড়ী ঢলের প্রভাবে হাওর অঞ্চলে ব্যাপক ফসল ও সম্পদের ক্ষতির ফলে সংশোধিত কাবিতা নীতিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করে হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতে এ স্থানীয় সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে। ফলে ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত সফলভাবে সম্পাদন সম্ভব হয়েছে। ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতে যথাক্রমে প্রায় ১৫৩ কোটি ও ৯৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ফলশ্রুতিতে হাওরে ফসলের বাম্পার ফলন হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত কাজ চলমান রয়েছে। তবে স্থানীয়দের মতে বছর বছর হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত কাজের কারণে হাওরের জীববৈচিত্র্য বিশেষ করে মৎস প্রজাতির সংখ্যা ও প্রজাতি সংকটাপন্ন হতে পারে। তাই সংশ্লিষ্টদের হাওরের ফসল রক্ষার পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য রক্ষায় টেকসই প্রকল্প গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

হাওরে সারা বছরে কেবল একটি ফসল হয়, যা বোরো মৌসুমে আবাদের সময়। বর্তমানে হাওরের জনসংখ্যা প্রায় দুই কোটি, যার সিংহভাগ (৯০ শতাংশ) কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে যেসব কৃষক হাওরাঞ্চলে চাষবাস করেন তাদের অনেকেই প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বড় কৃষিজমির মালিকানা অনুপস্থিত ভূস্বামীদের কাছে। তাদের কাছে এক ফসলি কিংবা দুই ফসলি জমি কিছুই আসে যায় না। এসব অঞ্চলের কৃষিকাজ এখন অনেক কৃষককে আর আকৃষ্ট করে না উপর্যুপরি অনিশ্চয়তার কারণে। প্রায়ই আগাম বন্যায় শুষ্ক মৌসুমের বোরো ধান পানিতে তলিয়ে যায় পাহাড়ি ঢলের পানিতে। তখন সেসব অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তায় সংকট দেখা দেয় এবং অভাবের তাড়নায় কৃষি সম্পৃক্ত জনবসতি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয় বার বার। ফলে মানুষ এখন এলাকা ছেড়ে আধুনিক জীবনের আশ্রয়ে পাড়ি জমায় শহরের দিকে। অথচ হাওরের এক ফসলি জমিকে জলাবদ্ধতা দূর করে তা দুই বা তিন ফসলি জমিতে রূপান্তর করা সম্ভব। অপরদিকে জলাবদ্ধতা-সহিষ্ণু জাতের বা গভীর পানির আমন ধানের জাতের চাষ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ভাসমান সবজি চাষ হাওরাঞ্চলেও ব্যাপক ভিত্তিতে চালু করা যেতে পারে।

আগাম বন্যার কারণে হাওরে প্রায়শই ধান উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কৃষকরা দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে পড়ে। আকস্মিক বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ধান চাষের এ ক্ষতি হ্রাস করতে হলে হাওর অঞ্চলের কৃষকের পছন্দমতো উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করার কার্যক্রম গতিশীল করতে হবে এবং সেই সঙ্গে কৃষক পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদি উন্নত জাতের ধানের বীজ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক বৈচিত্র্য ও সীমাবদ্ধতার কারণে সেখানে ফসল উৎপাদন যেমন কষ্টকর, তেমনি পর্যাপ্ত মূলধন, হাওর অঞ্চলের চাষ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান এবং ফসল বিপণনের ধারণার অভাবে কৃষক প্রায়শই ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

হাওর হচ্ছে সারা বাংলাদেশের জন্য একটি ইকোসিস্টেম সার্ভিসের আধার। যারা এই সার্ভিসটা প্রদান করছে, তারাই বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র, সুতরাং তাদেরকে কীভাবে কমপেনসেট করা যায় সেই বিবেচনা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে শস্যবীমা ব্যবস্থা নেই; কিন্তু হাওরের আগাম বন্যার জন্য শস্যবীমা নীতি গ্রহণ করা উচিত। একইসঙ্গে যদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জীবনকালের শস্য চাষের ব্যবস্থা করা যায় তা আরো কার্যকর হবে। এসব বিবেচনায় হাওরের কৃষিকে টেকসই করার জন্য জরুরিভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান সরকার দেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের সফল উদ্যোগে হাওর হতে পারে পর্যটন পিয়াসীদের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। অর্জন হতে পারে এ শিল্প থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব। হরেক প্রজাতির পরিযায়ী ও আবাসিক পাখির বিচরণ হাওরে। পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত হয় চারপাশ। রঙবেরঙা অসংখ্য চেনা-অচেনা পাখির মনোমুগ্ধকর মেলা আকৃষ্ট করে হাওরপ্রিয়

মানুষকে। সবকিছু মিলিয়ে হাওর হতে পারে পর্যটন বিকাশের বিরাট উৎস। বর্ষায় যৌবনবতী হাওর সাগরের মতো অনন্ত অসীম জলাধার। দূরের আকাশ আর পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য হৃদয়কাড়া। হাওরে নৌকা ভ্রমণে চাঁদনী রাতের স্মৃতি জীবনে একবার গেঁথে নিলে আমৃত্যু সে তৃষ্ণা থেকে যাবে। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে সরকার।

টাংগুয়ার হাওরসহ আশপাশের পর্যটন এলাকায় পর্যটকদের মানসম্মত খাওয়া ও বাসস্থানের সুযোগ না থাকায় বিশাল সম্ভাবনা থাকা সত্বেও পর্যটক আকর্ষণ করা যাচ্ছে না। সমস্যা সমাধানে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে হোটেল মোটেল স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়াও ট্যুরিস্ট গাইড তৈরী করা যেতে পারে। ইকো ট্যুরিজম ও হতে পারে হাওরাঞ্চলের বিকল্প কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয়ের অন্যতম খাত। সুনামগঞ্জ জেলা শহর হতে উল্লেখিত স্থান সমূহে যাতায়তের জন্য উপযুক্ত কোন রাস্তা না থাকায় অনেক লোক সুনামগঞ্জের দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন না করেই জেলা শহর হতে ফিরে যায়। সুনামগঞ্জ জেলা শহর হতে উল্লিখিত স্থানসমূহে যাতায়তের জন্য যোযাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন তথা মান সম্মত রাস্তা নির্মাণ/সংস্কার করা হলে একদিকে যেমন পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটবে অন্যদিকে সরকারের রাজস্ব আয় ও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া হাওর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পর্যটন শিল্পকে ঘিরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় সুনামগঞ্জ হতে তাহিরপুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারসহ (০১) সুনামগঞ্জ শহর হতে পলাশ জিসি আরএইচডি) (০২) বিশ্বম্ভরপুর-পলাশ-চিনাকান্দি সড়ক (পলাশ আরএইচডি হহতে ধনপুর পর্যন্ত) (০৩) ধনপুর-তরঙ্গিয়া-আনন্দবাজার-লাউড়েরগড় (বিশ্বম্ভরপুর অংশ) (০৪)আনন্দবাজার-লাউড়েরগড় (দঃ বাদাঘাট ইউপি) তাহিরপুর অংশ-বিন্নকুলি হইতে আনন্দবাজার (০৫) মহেষখলা-পলাশ জিসি ভায়া বিন্নাকুলি সড়ক (তাহিরপুর অংশ-বাঙগাল ভিটা হতে বিন্নাকুলি পর্যন্ত) (০৬) মধ্যনগর-মহেষখলা হতে টেকেরঘাট সড়ক (ধর্মপাশা অংশ) (০৭) তাহিরপুর উপজেলা সদর হতে কাউকান্দি জিসি পর্যন্ত সড়ক (০৮) কাউকান্দি জিসি হতে টেকেরঘাট ভায়া বালিয়াঘাটা সড়ক নির্মাণ করা প্রয়োজন।

দেশের বৃহত্তম দুই হাওর হাকালুকি ও টাংগুয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের বৃহত্তম মিঠা পানির জলাভূমি হিসেবে পরিচিত সিলেট ও মৌলভীবাজারের ৫টি উপজেলা নিয়ে বিস্তৃত হাকালুকি হাওর প্রায় ২৩৮টি বিল ও ১০টি নদীর সমন্বয়ে গঠিত। হাকালুকি হাওরে শীতকালে পরিযায়ী পাখির আগমন ও স্থানীয় প্রায় ১০০ প্রজাতির পাখির কলতান মুখরিত পরিবেশ ভ্রমণ পিপাসুদের আহ্বানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সুনামগঞ্জ জেলার সীমান্তে সবুজে ঘেরা সুবিস্তৃত পাহাড়, টাংগুয়ার হাওর, টাংগুয়ার হাওড়ে বছরের প্রায় সবসময় বিশেষ করে শীতকালে প্রচুর দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, নীলাভ জলরাশির সিরাজ লেক,মনোমুগ্ধকর বারেকের টিলা, সবুজ পাহাড় ঘেষে টেকেরঘাট চুনাপাথর খনি প্রকল্প, মনোলোভা শিমুল বাগান, হলহলিয়া জমিদার বাড়ী, প্রায় ২০০০ বছরের প্রাচীন পুরান লাউড় রাজ্যের রাজধানী লাউরের গড়,শাহ আরেফিনের মাজার, শ্রী অদ্বৈত্য মহাপ্রভুর আখড়া/মন্দির প্রভৃতি দর্শনীয় ও ধর্মীয় স্থান রয়েছে। বিশেষ করে বিশাল জলরাশি সমৃদ্ধ পাহাড় ঘেষে টাংগুয়ার হাওর (১০৩১তম রামসার সাইট), যা ধর্মপাশা ও তাহিরপুর উপজেলা জুড়ে বিস্তৃত। সুনামগঞ্জের বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ ছোট-বড় ৫১টি বিলের সমন্বয়ে গঠিত টাংগুয়ার হাওরকে সম্পদ ও সৌন্দর্যের রাণী হিসাবে অভিহিত করা হয়।
বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ সুনামগঞ্জের টাংগুয়ার হাওর পরিযায়ী পাখির অভয়াশ্রম। প্রায় ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এ হাওরটি বাংলাদেশর দ্বিতীয় বৃহত্তম মিঠা পানির জলাভূমি। স্থানীয় লোকজনের কাছে হাওরটি নয়কুড়ি কান্দা ছয়কুড়ি বিল নামেও পরিচিত। এটি সুন্দরবনের পরই বাংলাদেশের দ্বিতীয় রামসার স্থান। পরিবেশবাদীদের গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বে বিপন্ন প্রায় বিরল প্রজাতির ২ শতাধিক পাখি এবং বিপন্ন ১৫০ প্রজাতি মাছের সমাগম এ হাওরে। টাংগুয়ার রয়েছে স্তন্যপায়ী দুর্লভ জলজ প্রাণী গাঙ্গেয় ডলফিন (শুশুক), খেঁকশিয়াল, উঁদ, বনরুই, গন্ধগোকুল, জংলি বিড়াল। উদ্ভিদের মধ্যে নলখাগড়া, হিজল, করচ, বরুণ, রেইনট্রি, পদ্ম, বুনো গোলাপসহ ২০০ প্রজাতির অধিক দেখা মেলে।

বাংলাদেশের হাওরগুলোর আছে মনোমুগ্ধকর নাম যেমন- টাংগুয়ার হাওর, শনির হাওর, টগার হাওর, মাটিয়ান হাওয়ার, দেখার হাওর, হালির হাওর, কড়চা হাওর, পাকনা হাওর, ধলা পাকনা হাওর, আঙ্গরখালি হাওর, খচ্চর হাওর, নখলা হাওর, সানুয়াডাকুয়া হাওর, শৈল চকরা হাওর, হৈশাম হাওর, বড় হাওর, হালিয়ার হাওর, চন্দ্রসোনার থাল হাওর, ডিঙ্গাপুতা হাওর প্রভৃতি।

হাওর এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাষন ব্যবস্থার ব্যবহার দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে নাজুক। অশিক্ষা, অজ্ঞতা হাওর জনপদে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে আছে। ফলে তাদের ভেতর স্বাস্থ্যসচেতনতা কাঙ্খিত পর্যায়ে নেই। নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর

স্যানিটেশন বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় দূষিত হচ্ছে পানি। হাওর জনপদে লেগেই আছে পানিবাহিত রোগ। কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, কৃমি ও জণ্ডিসের মতো রোগবালাই সারা বছরই দেখা যায় হাওরের কোনো না কোনো ঘরে। বর্তমান সরকার এসডিজি (SDG) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে হাওর এলাকায় নিরাপদ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

স্বাধীনতার মৌলিক স্বাদ থেকে বঞ্চিত এখনো হাওরের মানুষ। কৃষিভিত্তিক হাওরের জনজীবনে সংকট এখনো নিত্যদিনের সঙ্গী। শিক্ষার দিক থেকে হাওর অঞ্চল এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে প্রাইমারি অতিক্রম করতে পারে না। সুনামগঞ্জ জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৬৯টি। কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কলেজ এর সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। ইউনিসেফ ২০১৯ এর তথ্য অনুযায়ী সুনামগঞ্জ জেলায় শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ৩৭%। হাওর জনপদের অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারের অভিভাবকগণ পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা অসচেতন থাকলেও বর্তমানে সমাজের উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের মত প্রান্তিক সমাজের অভিভাবকদের কাছেও প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিভাবকগণ তাদের সন্তাদের মৌলিক শিক্ষা হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষাকে বেছে নিচ্ছেন। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের অংশগ্রহণ উল্লেখ যোগ্য হারে বেড়েছে। ২০১৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ৯১.৯৫%।

হাওরে শিশুদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু জ্ঞানার্জনের জন্য হলেই চলবে না, শিক্ষা হতে হবে জীবনমুখী এবং বাস্তবভিত্তিক। শিক্ষার মাধ্যমে যেন শিক্ষার্থী তার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আশাব্যঞ্জক হলো বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের সাথে সাথে বর্তমান যুগে ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় অংশ গ্রহণের হার বেড়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার পরিমাণ ও গুণগত মানও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন হয়েছে। সরকারের নানামুখী উদ্যোগ সত্ত্বেও হাওর এলাকার শিক্ষার সংখ্যাগত ও গুণগত মানের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জিত হয়নি। পরিস্থিতির উন্নয়নে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১ম পর্যায়ে শিক্ষকদের আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করা যেতে পারে। ২য় পর্যায়ে চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ে আবাসিক সুবিধার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংযোগ সড়কগুলো জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ,সংস্কার ও মেরামতের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে বর্ষা মৌসুমেছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ে যাতায়তের জন্য নৌকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বসতবাড়ীর সাথে বিদ্যালয়ের বিচ্ছিন্নতার কারণে হাওর এলাকার সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করা যেতে পারে। সর্বোপরি সন্তানদের বিদ্যালয়মূখী করার সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে প্রান্তিক পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ে অভিভাবক সমাবেশসহ মোটিভেশন কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাবে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহে (Tropical countries) বজ্রপাতের তীব্রতা এবং সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর তাপমাত্রা দশমিক চার (০.৪) ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তখন বজ্রপাতের হার প্রায় ০৮% বাড়বে। জ্বালানী ব্যবহার বৃদ্ধি, অত্যাধিক শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহার, গ্রিন হাউজ গ্যাসের নির্গমন বৃদ্ধির কারণে গোটা বিশ্বেই বজ্রপাত বাড়চ্ছে।

বাংলাদেশে মার্চ-এপ্রিল হচ্ছে বজ্রপাতের মৌসুম। হাওর এলাকায় ধান কাটা ও মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে প্রাণহানী বেশী হয়ে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে কেবল ২০১৮ সালে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার ১১টি ইউনিয়নে ৬৮ জন বজ্রপাতের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণায় সুনামগঞ্জ তথা হাওর এলাকায় বজ্রপাতের কারণ হিসেবে গাছপালাহীন বিশাল এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সমস্যা নিরসণে খোলা মাঠ এবং হাওর-বাওর এলাকায় একটি নিদিষ্ট দূরত্ব পর পর বজ্রপাত নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। আশ্রয়কেন্দ্রগুলো বজ্রপাত তথ্যকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারসহ বছরের বিভিন্ন সময় ধান মাড়াই ও মজুদ এবং শুটকি তৈরি ও মজুদের কাজে ব্যবহার করা যাবে। তাছাড়া হাওর এলাকাতে বজ্রপাত কারণে প্রাণহানী দূর করতে পানি সহনীয় হিজল-করচ,তাল,কদম গাছ রোপন করা যেতে পারে এবং বিদ্যমান ভবনসমূহে বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপন করা যেতে পারে।

প্রতি বছর পাহাড়ি ঢলে প্রচুর পরিমাণে সিলিকা বালি, পলিমাটি হাওর, খাল ও নদীতে এসে জমা হচ্ছে এর সাথে ধান ও হাওরের গাছপালার-আগাছা পচাও যুক্ত হচ্ছে। এসকল কারণে হাওর,খাল ও নদীর নাব্যতা নষ্ট হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন হাওরের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। হাওর এলাকার স্বাভাবিক নৌ যোগাযোগ বর্ষা মৌসুমে ঠিক

থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে ব্যাহত হচ্ছে। হাওর, খাল ও নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় ফাশ ফ্লাড বা পাহাড়ি ঢল ও সামান্য আগাম বৃষ্টির পানিতে হাওরের ধান পানিতে ডুবে যাচ্ছে, কৃষকের ধান নষ্ট হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানকল্পে হাওর, খাল ও নদীকে জাতীয় খনন বা ন্যাশনাল ড্রেজিং এর আওতায় আনতে হবে। হাওর,খাল ও নদীর গভীরতা নিশ্চিত করা গেলে হাওর এলাকার মানুষের যোগাযোগের সহজলভ্যতা নিশ্চিত হবে ও যোগাযোগ ব্যয় ও অনেকাংশে কমে যাবে। হাওর, খাল, নদী প্রাথমিকভাবে পাহাড়ি ঢল, আগাম বন্যা ও অতি বৃষ্টির পানি ধারণ করে দুর্যোগের প্রাথমিক ধাক্কা থেকে হাওরের ফসল রক্ষা করা যাবে। স্বাভাবিক নৌ যোগাযোগ রক্ষার্থে নদীতে ব্রিজ নির্মাণের সময় বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। হাওর এলাকায় যে কয়টি নদী ও খাল রয়েছে তা দিয়ে যেন হাওরের অতিরিক্ত পানি এবং বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের পানি দ্রুত চলে যেতে পাড়ে সেজন্য কিশোরগঞ্জের ভৈরব পর্যন্ত নদীতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা নিশ্চিত করতে হবে যাতে পানির নামার স্বাভাবিক পথ সারা বছর ঠিক থাকে, মেইনটন্যান্স ড্রেজিং অব্যাহত রাখতে হবে এবং ২০১৭ সালের ২৯শে মার্চের মত অতি বৃষ্টি ও আগাম পাহাড়ি ঢলের হাত থেকে হাওরের ফসল রক্ষা করা যায়। নদী, খাল ও হাওরের নাব্যতা নিশ্চিত করা গেলে পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দেশীয় মাছের বিলুপ্তি দূর করা যাবে। ইতোমধ্যে হাওরে বিলুপ্ত মিঠা পানির প্রায় ১০০টি প্রজাতির মাছের জাত পুনঃউৎপাদন করা হয়েছে।

হাকালুকি হাওর

হাওর এলাকার অন্যতম সমস্যা হচ্ছে জ্বালানি সমস্যা। পানির আধিক্য ও পর্যাপ্ত উঁচু জমির স্বল্পতার কারণে এ এলাকায় গাছ-পালার সংখ্যা খুব কম। ফলশ্রুতিতে হাওরে বিদ্যমান গাছপালাও মানুষের জ্বালানি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে হাওরের পরিবেশের ভারসাম্য ও প্রতিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। হাওরের এ সমস্যা স্বল্প সময়ে সমাধানের জন্য পতিত জমি, বোরো ফসল সংগ্রহের পর পতিত জমি ও ফসল রক্ষার জন্য হাওরের যে বাঁধ রয়েছে তার উপর ধইঞ্চ্যা চাষ করা যেতে পারে। ধইঞ্চ্যা দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় স্বল্প সময়ে হাওরে পানি আসার আগে তা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী হবে। হাওরে গো-খাদ্যের সংকট ও প্রকট। ধইঞ্চ্যা গাছের বীজ গো খাদ্য হিসেবেও উৎকৃষ্ট যার ফলে গো-খাদ্যের সংকট নিরসন হবে। অন্যদিকে হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধের উপর ধইঞ্চ্যা গাছ রোপন করার কারণের হাওর রক্ষার বাঁধ টেকসই ও মজবুত হবে সাথে সাথে হাওরের পরিবেশ সুরক্ষা হবে। তাছাড়া ধইঞ্চ্যা গাছের পাতা উৎকৃষ্ট (কম্পোস্ট) জৈব সার হওয়ায় তা ধান চাষে কম সারের প্রয়োজন হবে। ধইঞ্চ্যা চাষ শস্যাবতন হিসেবে কাজ করবে। হাওরের পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষা ও জ্বালানি সমস্যা সমাধান কল্পে দীর্ঘ মেয়াদে হাওরে পানি সহনীয় হিজল-করচ,তাল ও কদম গাছ লাগানো যেতে পরে। সরকার এক্ষেত্রে হাওর রক্ষার বাঁধ ও সরকারি পতিত জমিতে সমবায়ের মাধ্যমে স্থানীয় অংশীজনের সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। এতে হাওরের পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় জনগণ উৎসাহ পাবে পরিবেশের উন্নয়ন গতিশীল হবে। হাওরের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, শীতকালে হাওরে আগত পরিযায়ী পাখিদের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চতকরণ এবং হাওরের বজ্রপাতে প্রাণহানীও কিছুটা দূর করা যাবে।

অসীম সম্ভাবনা বুকে ধারণ করে জেগে আছে হাওর। সম্ভাব্য সবকিছু থাকা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে হাওরাঞ্চল গুরুত্বহীন অব্যবস্থাপনার অনগ্রসরমান অবস্থায় পতিত। দেশকে দুই হাত ভরে দিয়েও দরিদ্রতাই তাদের সর্বশেষ পুঁজি। দুর্গম এলাকার এ সংগ্রামী মানুষ দুর্যোগ-দুর্বিপাকে দুর্বিষহ জীবন পার করে থাকে। বর্তমান সরকার হাওরের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। রাষ্ট্র যদি হাওরের অপার সম্ভাবনা ও সুযোগকে কাজে লাগায়, তাহলে একদিকে যেমন হাওরবাসী উপকৃত হবে, তেমনি দেশ অর্থনীতিতে আরও সমৃদ্ধশালী হবে। হাওরাঞ্চল উন্নয়নে সরকারের জন্য বিবেচ্য বিষয় হতে পারে:

১) হাওরবাসীদের ফসল রক্ষার জন্য নদী-নালা, খাল-বিল, হাজা-মজা পুকুর-ডোবা কাজের বিনিময়ে খাদ্যে কর্মসূচির আওতায় খনন করতে হবে ২) নদীর দু'পাড়ে, হাওরের পতিত উচু জমিতে, গ্রামের চারপাশে ব্যাপক হারে পানি সহিষ্ণু বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে জঙ্গল তৈরি করে জ্বালানি কাঠের চাহিদা মিটানো যেতে পারে। জঙ্গলে বর্ষায় মাছের উত্তম জায়গা হবে। প্রচুর খাবার মিলবে। পাখিদের অভয়াশ্রম তৈরি হবে ৩) ঢেউ-এর আঘাতে অরক্ষিত ভিটেবাড়ী রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে ৪) শুধু ধান চাষে নির্ভরশীল না করে হাওরবাসী কৃষকদের বহুমুখী চাষাবাদে আগ্রহী করতে হবে, কৃষকদেরকে চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে ৫) হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরকে প্রশাসনিক, অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে ৬) হাওর মৎস্য ও কৃষি ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা যেতে পারে ৭) হাওরাঞ্চলের অবস্থা, প্রকৃতির ধরণ, অবকাঠামোর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার স্থায়ী অবকাঠামোগত ব্যবস্থা এবং ভাসমান/ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে ৮) হাওরাঞ্চলে কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে হাওরের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক ফ্যাকাল্টি রাখা যেতে পারে ৯) ঋণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প চালু করতে হবে ১০) হাওরাঞ্চলের প্রকৃতি পরিবেশকে উপজীব্য করে সেখানে পর্যটন ব্যবস্থা করতে হবে ১১) দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হাওরাঞ্চলের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা ও পাঠ পরিক্রমা চালু হতে পারে ১২) হাওর এলাকার হাজার বছরে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবন-সংগ্রাম প্রভৃতির সংরক্ষণে সেখানে একটি 'হাওর মিউজিয়াম' করা অত্যাবশ্যক ১৩) হাওরে সৌর বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক বিদ্যুত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে ১৪) নারীদের কর্মমুখী করে গড়ে তুলতে হবে। হাঁস, মুরগি, কবুতরসহ গৃহপালিত পশুপালন, সবজি উৎপাদন, মুড়ি, চিড়া, খৈ তৈরি ও প্যাকেটজাতকরণ, শুটকি তৈরি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, হস্ত ও কুটিরশিল্পখাতে নারীদের নিয়োজিত করা যেতে পারে ১৫) মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র, একাধিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন এবং বর্ষায় হাওরের পানিতে নির্দিষ্ট স্থানে ঘের করে দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা ব্যাপকভাবে অবমুক্ত করতে হবে এই পোনা বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষার পর মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্ত করা যেতে পারে। মুক্ত জলাশয়ে ঘের পদ্ধতিতে মাছ চাষ এবং ভাসমান সবজি চাষের কথা ভাবা যেতে পারে। ১৬) শুকনা মৌসুমে দেখা যায় মাঠের পর মাঠ ঘাস আর ঘাস। এই ঘাস আর মাঠকে কেন্দ্র করে দুগ্ধ খামার, গরু মোটাতাজাকরণ ও ছাগল প্রকল্প করা যেতে পারে। তবে দুগ্ধ খামারের ক্ষেত্রে বর্ষায় গরুর বিকল্প খাবারের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে ১৭) শুকনা সময়ে পতিত চট্টন এলাকাকে কী করে উৎপাদনশীল হিসেবে তৈরি করা যায় সে ব্যবস্থা নিতে হবে। সেখানে পুরো ৬ মাসে উপযোগি সবজি ও শস্য উৎপাদনের কথা ভাবা যেতে পারে ১৮) হাওরাঞ্চলের প্রকৃতি পরিবেশকে উপজীব্য করে সেখানে পর্যটন ব্যবস্থা করতে হবে ১৯) ছাতক-সুনামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ রেলপথ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

শব্দদূষণ: একটি নীরব ঘাতক এবং আমাদের করণীয়

সৈয়দ ফরহাদ হোসেন*

শব্দদূষণ বলতে সাধারণত মানুষের বা কোনো প্রাণীর শ্রুতিসীমা অতিক্রমকারী কোনো শব্দকে বোঝায় যার কারণে শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আকাঙ্খা থাকে। মানুষ বা প্রাণীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টিকারী শব্দই হলো শব্দ দূষণ। মানুষ সাধারণত ২০-২০,০০০ হার্জের কম বা বেশি শব্দ শুনতে পায় না। তাই মানুষের জন্য শব্দদূষণ প্রকৃতপক্ষে এই সীমার মধ্যেই তীব্রতর শব্দ দ্বারাই হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় শব্দদূষণ এক নীরব ঘাতকে পরিণত হয়েছে। শব্দ কান দিয়ে প্রবেশ করে মস্তিস্ক এবং শরীরে এক বিশেষ ধরনের অনুভুতি সৃষ্টি করে।

সারা বিশ্বের ৩০টি কঠিন রোগের অন্যতম কারণসমূহের মধ্যে শব্দদূষণ অন্যতম। কেন আমাদের শব্দদূষণকে গুরুত্ব দেয়া উচিৎ? শব্দদূষণে মানুষের শ্রবণ শক্তি হ্রাস ও স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ফুসফুসজনিত জটিলতা, অনিদ্রা, স্মরণশক্তি হ্রাস, মানসিক চাপসহ নানারকম স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। এতে শিক্ষার্থীদের মনযোগ নষ্টসহ মেধা বিকাশ ব্যাহত হয়। সিনিয়র সিটিজেন, গর্ভবতী মা, ট্রাফিক পুলিশসহ জরুরী পেশায় নিয়োজিত মানুষদের নানা রকমের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়। (তথ্য সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)

উদ্ভিদ, শাক সব্জি ও কৃষি পণ্য (Plant Growth and Vegetation) এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সকল ধরনের উদ্ভিদ মানুষের মত সংবেদনশীল। এর দ্রুত বৃদ্ধি, উৎপাদনের জন্য একটি শান্ত, নীরব পরিবেশ প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে দীর্ঘ দিন উচ্চ শব্দে শস্যের উৎপাদন ও মান কমে যায়। শব্দদূষণ মানুষের মত পশুদের nervous system নষ্ট করে। ফলে পশুরা নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়, বিপদজনক হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত শব্দ পশুদের স্বাভাবিক এবং নির্ধারিত চলাচল (navigation) ব্যাহত করে,স্থানান্তরে বাধ্য করে। এর ফলে পশুর শিকার, খাদ্য প্রজনন ক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পরে। বয়স্ক পশু বা heart diseases এ আক্রান্ত হয়, পশুরা উচ্চ শব্দে মারা যেতে পারে। প্রানীকূলের মধ্যে উচ্চস্বরে শব্দ করার প্রবনতা তৈরি করে (Lombard vocal response)। আতশবাজীর আকস্মিক উচ্চ শব্দে এবং তীব্র আলোর কারণে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে আকাশ থেকে নীচে মাটিতে পরে/ভবনের দেয়াল/জানালায় ধাক্কা খেয়ে, বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে/গাড়ির নীচে পড়ে অনেক পাখির মৃত্যু হয়। নদী ও সামুদ্রিক পরিবেশ নদীতে চলমান জলযানের উচ্চ শব্দে indigenous species এর মাছের উৎপাদন ও প্রজনন কমে যেয়ে তা ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মিলিটারী সোনার (Military Sonar) এর তীব্র শব্দে বিশেষ প্রজাতির তিমির বৃদ্ধি, উৎপাদন ও প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে।

শব্দদূষণের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হলো দ্রুত নগরায়ন, যান্ত্রিক যানবাহন বৃদ্ধি, যানবাহনের অনিয়ন্ত্রিত হর্ন ব্যবহার, উচ্চ শব্দ তৈরিকৃত জেনারেটর ব্যবহার, অপরিকল্পিত শিল্প কল-কারখানা, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ। এছাড়া, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রচারণার কাজে ব্যবহৃত মাইক/সাইন্ড বক্স, আতসবাজি থেকে শব্দদূষণের সৃষ্টি হয়।

শব্দদূষণের উৎসসমূহ হচ্ছে যানবাহনের অতিমাত্রায় সাধারণ ও হাইড্রোলিক হর্ণের ব্যবহার, মটর সাইকেলের হর্ণ, মাইকের ব্যবহার, নির্মাণ কাজ, বিভিন্ন প্রচারণার কাজে ব্যবহৃত মাইক, লাউড স্পিকারের ব্যবহার, শিল্প কলকারখানায় উৎপাদিত শব্দ, বিস্ফোরণ, যে কোন স্থাপনা বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বা উৎসবে লাউড স্পিকারের ব্যবহার, উচ্চস্বরে কথা, বিমানের শব্দ, রেল/ট্রেন ও জলযান, আবাসিক কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি/উপকরণ উচ্চ শব্দ ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ শহরসমূহে শব্দের মাত্রা:

নাম	সর্ব্বোচ	সর্বনিম্ন
ঢাকা	১৩২ ডেসিবল	৪৭ ডেসিবল
চট্টগ্রাম	১৩৩ ডেসিবল	৪৭ ডেসিবল
সিলেট	১৩১ ডেসিবল	৫০ ডেসিবল
খুলনা	১৩২ ডেসিবল	৪২ ডেসিবল

*পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়

নাম	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
রাজশাহী	১৩৩ ডেসিবল	৫৬ ডেসিবল
রংপুর	১৩০ ডেসিবল	৪৬ ডেসিবল
ময়মনসিংহ	১৩১ ডেসিবল	৫৪ ডেসিবল
বরিশাল	১৩১ ডেসিবল	৫৪ ডেসিবল

উৎস: পরিবেশ অধিদপ্তর

শিশু, বৃদ্ধ ও কর্ম পরিবেশের উপর শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব:

- শব্দদূষণের স্থানসমূহে অধিক সময় অবস্থান করলে মারাত্মক মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি (হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, মাথা ধরা, বধির হওয়া, আতঙ্কগ্রস্থতা, অনিদ্রা ইত্যাদি) বেড়ে যাওয়া;
- যানবাহনের হর্ণ ও যন্ত্রাংশের মাধ্যমে শব্দদূষণের কারণে দাপ্তরিক কাজ, শিক্ষা কার্যক্রম, পথচারী, ট্রাফিক পুলিশ, রিকশাচালক, হকারগণই সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখীণ হন;
- বড় শহরগুলোতে নির্মাণ কাজ ও শিল্পকারখানার শব্দে হাসপাতাল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রোগী এবং শিক্ষার্থীরা বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে।
- শব্দদূষণের কারণে শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভবর্তী নারীরা বেশি ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করে;
- বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত লাউড স্পিকারের শব্দে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দাপ্তরিক কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনে ব্যাঘাত ঘটে।

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে/প্রতিরোধে আমাদের করণীয়:

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দদূষণ মানুষের দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই আমাদের সকলের সচেতনতা আর সামান্য চেষ্টায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। অতিরিক্ত শব্দের উৎসগুলো কমানোর ব্যাবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এছাড়াও শব্দদূষণকে রোধে বাংলাদেশ সরকার নানাবিধ আইন প্রণয়ন করেছেন। দেশের একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে আমাদের সেই সমস্ত আইন মেনে চলা উচিত। শব্দ দূষণের ব্যাপ্তি নিরসনে বিদ্যমান আইনসমূহ হচ্ছে-

- দণ্ডবিধি (The Penal Code) 1860 (OF OFFENCES AFFECTING THE PUBLIC HEALTH, SAFETY CONVENIENCE. DECENCY AND MORALS)
- মোটরযান আইন ১৯৮৮
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫
- শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬
- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০১৮
- স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন ২০০৯
- আমদানী নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮
- সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ

- শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ন নিষিদ্ধ। নীরব এলাকায় হর্ন বাজানো যাবে না।
- আবাসিক এলাকার ৫০০ মিটারের মধ্যে শব্দ সৃষ্টিকারী মেশিন ব্যবহার করা যাবে না।
- ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কারখানা মালিককে নির্দেশ দিতে পারবেন।
- কারখানা কর্তৃপক্ষকে শব্দদূষণ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- শব্দদূষণ বন্ধে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৌখিক বা লিখিতভাবে নির্দেশ দিতে পারবেন।
- কর্তৃপক্ষ সাইনবোর্ড স্থাপন ও সংরক্ষণ করবে।
- ভুক্তভোগী যে কেউ মৌখিক বা লিখিতভাবে অভিযোগ করতে পারবেন।

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর আলোকে দণ্ডসমূহ হচ্ছে প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দণ্ডে এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয়।

 বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুসারে নির্ধারিত শব্দ মাত্রার অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র ব্যবহার এবং ঘোষিত নীরব এলাকায় হর্ণ বাজানো একটি অপরাধ, এবং অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দণ্ড এবং চালকের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হইবে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প:

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর এই প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ বাস্তবায়নে অংশীজনদের দক্ষতা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে দূষণের মাত্রা, উৎস এবং এর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম (পাইলটিং) এর মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ১৯ হাজার ২ শত জন পরিবহন চালক/শ্রমিককে শব্দ সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প ২০২০ থেকে ২০২২ মেয়াদের মধ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে যা শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

 শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় হচ্ছে বিদ্যমান আমদানী নীতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৭৫ ডেসিবেল হর্ণ আমদানী নিশ্চিত করা, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক এলাকা ও অফিস পাড়া হতে সকল ধরনের শব্দ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অপসারণ। শব্দদূষণ তৈরিকারী ত্রুটিপূর্ণ বা মেয়াদ উত্তীর্ণ যান চলাচল বন্ধ এবং অনুমোদনহীন মটর ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ। পরিবহণ শ্রমিক ও ড্রাইভারদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, হর্ণ বাজানোর বিষয়ে ড্রাইভারদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আনয়ন। "শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা" ২০০৬ বাস্তবায়ন, রাইড শেয়ারিং সার্ভিস এর আওতায় কর্মরত ড্রাইভারদের সচেতনতা বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়নকালে অতিমাত্রায় শব্দ উৎপাদনে ও বায়ুদূষণরোধে কঠোরতা আরোপ করা। আবাসিক এলাকার মধ্যে নতুন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, গাড়ী মেরামতের ওয়ার্কশপ, মিল চালু না করা। আবাসিক এলাকা শব্দদূষণ মুক্ত করা, যে কোন ধরনের পণ্য /ব্যবসা /সেবা /শিক্ষা/প্রচার/ঘোষণা ইত্যাদির জন্য মাইক ব্যবহার বন্ধ করা, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সমাবেশে নির্ধারিত শব্দ মাত্রায় মাইক ব্যবহার। শব্দদূষণ বিষয়ে নাগরিক সমাজকে সচেতন, বিভিন্ন প্রচারণসহ সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ, মহাসড়ক/সড়ক/রেলপথগুলো জনবহুল এলাকা হতে দূরে নির্মাণ এবং যান চলাচলের বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কাজ করতে আগ্রহী তাদের সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ঐক্যবদ্ধ কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত দিক নির্দেশনা শব্দদূষণকে নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টির কোনও বিকল্প নেই। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য শব্দদূষণমুক্ত পরিবেশ গড়া সবারই কর্তব্য। তাই সবাই সচেতন হলে শব্দদূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া, আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি নীতিনির্ধারক এবং জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শব্দদূষণের মতো নীরব এই ঘাতককে আমরা প্রতিহত করতে পারবো।

সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ

ড. আসম হেলাল সিদ্দীকি*

সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ বাংলার রূপসী সম্পদ হিসাবে পরিচিত। সুন্দরবনের বিশেষ করে পূর্ব দিকের সুন্দরবনের বলেশ্বর নদীর ইলিশ ও চন্দনা ইলিশ মাছ খুবই সুস্বাদু, মুখরোচক ও লোভনীয় দামী জলজ সম্পদ। সাধারণত আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন নদী খালে ইলিশ মাছের প্রাধান্য থাকে এবং জেলেরা ঐ সময় প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ সংগ্রহ করে থাকেন। এছাড়া সুন্দবনের প্রায় সকল নদ-নদী ও খালে প্রচুর পরিমাণে মিঠা পানি ও নোনা পানির মাছ জন্মে। সুন্দরবন প্রায় চারশতাধিক নদী ও খাল দ্বারা বেষ্ঠিত। এ সকল নদী অধিকাংশই বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কাজেই বঙ্গোপসাগরের অনেক প্রজাতির মাছ ও জলজ সম্পদ সুন্দরবনের নদীতে পাওয়া যায়। আসলে সুন্দরবন মৎস্য সম্পদে ভরপূর রূপালী সম্পদের অভয়ারণ্য বললে অত্যুক্তি হয় না। সুনদরবন মৎস্য সম্পদের উপযুক্ত প্রজনন ক্ষেত্র ও মৎস্যচারণ কেন্দ্রে।

সুন্দরবনে প্রায় চার শতাধিক প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এখানে গলদা ও বাগদা চিংড়িসহ ২৭ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। সুন্দরবন তথা দক্ষিণাঞ্চলের গলদা ও বাগদা চিংড়ির সুনাম শুধু দেশেই নয়। এর সুনাম বিশ্বজোড়া। এ সম্পদ রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া সুন্দরবনের বিভিন্ন নদ-নদীর কাকড়া, কাছিম অন্যতম বিখ্যাত জলজ সম্পদ। সুন্দরবন হতে প্রচুর পরিমাণ রাজকাকড়া সংগৃহীত হয়ে থাকে।

সুন্দরবনের মূল্যবান মাছের মধ্যে কোরাল, পাঙ্গাস, লৈট্যা, ভোলা, ছুরি, টেংরা, পোওয়া, চাপিলা, শাপলাপাতা, ওলুয়া, রূপচাদা, সাগরকই, টাকাচান্দা, বাটা, জ্যুতিমাছ, পানমাছ, চম্পা, পটকা, চাকা চিংড়ি, শোল, বোয়াল, রুই, কাতল, বেলে, পাবদা, কেয়া, দাতনে, ফালমে, রাসচোষ, কাইন মাগুর, ঘাংরা টেংরা, জাবা, ভেটকি, টাকি, শিং, চিত্রা, ডগরি, চেওবেলে, গুলসা, আমাদি, কাওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য পোনা তথা বাগদা ও গলদা চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে লোনা ও মিঠা পানির পুকুরে চাষ করা হয়। সুন্দরবন হতে প্রায় সারা বছরই এ পোনা সংগ্রহের কাজ চলে। সুন্দরবনের দুবলা জেলে পল্লীতে শীতকালে প্রচুর পরিমাণে মাছ সংগ্রহ করে শুটকী করা হয় এবং দেশে বিদেশে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।

সুন্দরবনের নদী

যদিও সুন্দরবনের নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় তথাপিও আগের তুলনায় এখন মাছ ও মাছের পোনা অনেকটা কমে গেছে। একসময় আশি ও নববই এর দশকেও সুন্দরবনের নদী খালে ছোট নৌকা নিয়ে চরে উঠতে গেলে মাছ লাফাতো এবং অনেক সময় নৌকার মধ্যেও

*বিভাগীয় কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, খুলনা

মাছ লাফিয়ে ধরা পড়ার নজির আছে। যাহোক বিভিন্ন কারণে সুন্দরবন হতে মাছের পরিমাণ কমে আসছে যেমন, সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় অধিক জনসংখ্যার বসতি, সারা বছর ধরে মৎস্য শিকার, চিংড়ি পোনা ধরার সময় অন্য পোনা ধ্বংস করা, কারেন্ট জাল ব্যবহার করা, নদীতে থাইডিন জাতীয় বিশ প্রয়োগ করে নির্বিচারে মাছ ও মাছের পোনা নিশ্চিহ্ন করা, নিষিদ্ধ ও সংরক্ষিত নদী-খালে মাছ সংগ্রহ করা, নদীর কিনারে ভেঙ্গে পড়া গাছ উৎপাটন, কেয়াকাটা ও ঝোপঝাড় সদৃশ্য নদী পাড়ের জংগল কেটে বনভূমিতে প্রবেশ করা, তৈল, কার্বন, বর্জ্য, ফার্ণেস অয়েল, লুব্রিকেন্ট ও শিল্পবর্জ্য নদীর জলে প্রবেশ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাজেই সুন্দরবনের মৎস্য ও মৎস্য পোনা সংরক্ষণের জন্য কতকগুলো কাজ ও নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। যেমন-

১. চিংড়িপোনা সংগ্রহের সময় অন্যান্য সকল পোনা আবর্জনাসহ অতিদ্রুত নদীর পানিতে ফেলতে হবে যেন অন্যান্য মাছের পোনা মারা না যায়।
২. কারেন্ট জাল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।
৩. মাছের প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করতে হবে।
৪. নিষিদ্ধ ঘোষিত নদী ও খালে মৎস্য আহরণ বন্ধ করতে হবে।
৫. আমরা জানি প্রত্যেক প্রাণির জন্য একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন। সেজন্য নদীর পাড়ে ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় বড় ও ছোট গাছ-পালা অপসরণ বন্ধ করতে হবে।
৬. এছাড়া নদীর কিনারে প্রয়োজনে গরান ও গোলপাতা প্রভৃতি গাছের খাঁচা তৈরি করে মাছের আশ্রয় স্থল বৃদ্ধি করে মাছের প্রজনন নির্বিঘ্ন করতে হবে।
৭. জংগলে প্রবেশের সময় এবং জংগলের ভিতরে ফাঁকা জায়গা কেয়াকাটা, ধানশি, হোগলা, হুদোবন, লতাসুন্দরী প্রভৃতি কেটে না ফেলা, কারণ জলজ প্রাণীরা এসকল আগাছা বা জংগলের পার্শ্বে আশ্রায় গ্রহণ করে।
৮. শিল্প কারখানার বর্জ্যসহ, তৈল, কার্বন, ফার্ণেস অয়েল, লুব্রিকেন্ট ও শিল্প বর্জ্য নদীতে ফেলা বন্ধ করতে হবে।
৯. সুন্দরবনের উপরের দিকের জল গড়িয়ে নদী পথে সুন্দরবনে প্রবেশ করে। কাজেই বিল ও বাওড়ের জমিতে বোরো ফসলের সময় কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
১০. সুন্দরবনের নদ-নদীর মধ্যে জলযান চলাচলের সময় গতিসীমা সীমিত রাখতে হবে এবং মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র ও প্রজনন ঋতুতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

উপরিল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ যথাযথভাবে পালন করলে সুন্দরবনে মৎস্য ও পোনা মাছ সুরক্ষা করা অনেকটা সম্ভব হবে।

বগুড়ার গাবতলি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কমিটির পরিচিতি

মোঃ ফজলে বারী*

ফুলে ফলে সুশোভিত আমাদের এই বাংলাদেশ। আজ এই সুন্দর বাংলাদেশ তথা গোটা পৃথিবীর বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ বিপন্ন। মানবসভ্যতা তাই হুমকির সম্মুখীন। পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অনেক প্রজাতি আজ আমাদের নানামুখী কর্মকাণ্ডের কারণে হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এই পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। মানব সৃষ্ট এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব মানুষেরই। পরিবেশের এই সংকটাপন্ন অবস্থায় বন্যপ্রাণী, পাখি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বগুড়ার গাবতলি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কমিটি। ২০০৬ সালের ৭ অক্টোবর বগুড়া জেলার গাবতলি উপজেলার জয়ভোগা গ্রামের একজন ফজলে বারী রতনের আহ্বানে তার বাসভবনে এলাকার তরুণ সমাজ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গ্রামের এক বর্গ কিলোমিটার আয়তনের প্রাকৃতিক বনভূমিকে 'পাখির ভিটা' নামকরণ করে বন্যপ্রাণীদের অভয়াশ্রম হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়। ঐ দিন থেকেই 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কমিটি' জয়ভোগা গ্রামসহ গাবতলি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কার্যক্রম শুরু করে।

বগুড়ার গাবতলি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কমিটির উদ্যোগে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস পালিত।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ক) বন্যপ্রাণীদের প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।
খ) জীববৈচিত্র্যে ভরপুর ভারসাম্যপূর্ণ সুন্দর পরিবেশে কৃষি ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়ন।
গ) গাবতলি, সারিয়াকান্দি উপজেলাসহ সমগ্র বগুড়া জেলাকে বন্য পশু-পাখিদের জন্য মুক্ত স্বাধীন মডেল জেলা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।
ঘ) আহত ও বিপন্ন বন্যপ্রাণীদের আশ্রয়কেন্দ্র ও চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

সংগঠনের কার্যক্রমসমূহ:

ক) ২০০৬ সালে গাবতলি উপজেলার জয়ভোগা গ্রামে প্রায় ১ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের গ্রামীণ জঙ্গলকে ঘিরে 'পাখির ভিটা' নামক অভয়াশ্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং পাখির ভিটায় একটি সংরক্ষিত বাগান সৃজন করা হয়েছে।

*সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া

খ) গাবতলি উপজেলার 'আকন্দপাড়া-ডঙরবিল' এলাকায় পাখিদের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে পাখিদের নিরাপদ আবাস ও প্রজনন নিশ্চিত করা হয়েছে।

গ) সমগ্র গাবতলি উপজেলাকে বন্যপশু পাখিদের জন্য মুক্ত ও নিরাপদ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গাবতলি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে আমাদের কমিটি কার্যকর রয়েছে।

ঘ) বগুড়াসহ সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাইনবোর্ড স্থাপন, লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং করা হচ্ছে।

ঙ) বন্য পশুপাখিদের ক্রয়-বিক্রয় ও পাচার বন্ধে বগুড়া জেলার বিভিন্ন হাটে বাজারে প্রচার চালানো হচ্ছে।

চ) পাখিশিকারী ও ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরী করে তাদেরকে এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চলছে।

ছ) সর্বস্তরের জনগণকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে সভা সমাবেশ ও গণসংযোগ করা হচ্ছে।

জ) বন্য পশুপাখিদের খাদ্য ও বাসস্থান নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ রোপন চলছে।

ঝ) আহত ও বিপন্ন বন্য পশু ও পাখি উদ্ধার ও যথাযথ চিকিৎসা সেবা প্রদান ও প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ২০০টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার ও পরিচর্যা শেষে অবমুক্ত করা হয়েছে।

ঞ) বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী কর্তৃক বন্যপ্রাণী শিকারের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা হচ্ছে।

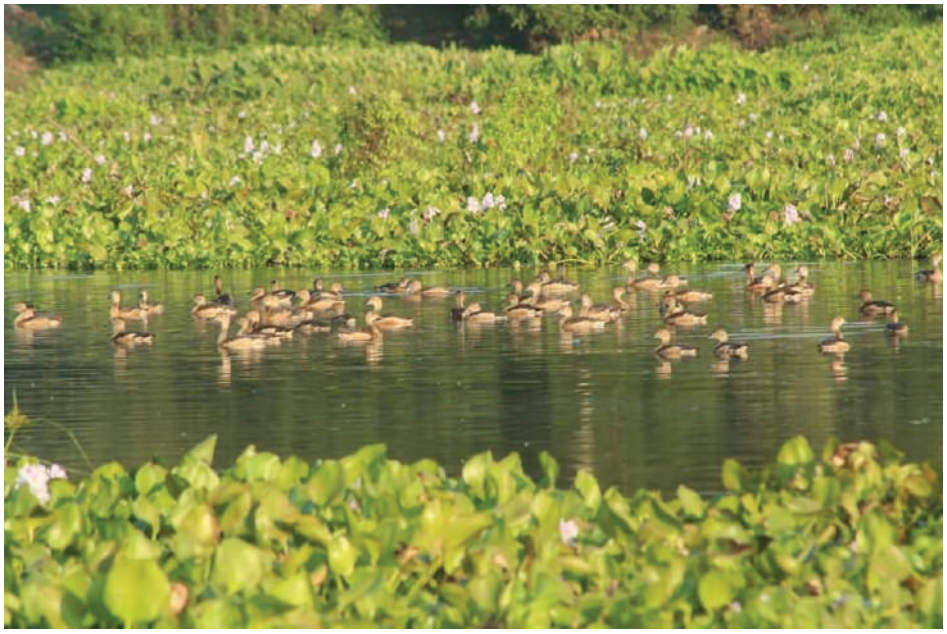

বগুড়ার গাবতলি উপজেলায় "আকন্দপাড়া-ডওর বিল পাখি অভয়াশ্রমে" এক ঝাঁক পাতি সরালি।

বগুড়ার গাবতলি উপজেলায় "আকন্দপাড়া-ডওর বিল পাখি অভয়াশ্রমে" এক ঝাঁক পাতি সরালি।

ট) ফসল রক্ষার নামে কৃষকের দেয়া কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধের চেষ্টা চলছে। জালে আটকে পড়া পশু-পাখি অবমুক্ত করা হচ্ছে।
ঠ) বগুড়ার গাবতলি উপজেলার ধনঞ্জয় গ্রামে "ধনঞ্জয়-বুরুঙ্গী বিল পাখি অভয়াশ্রম" গড়ে তোলা হয়েছে।
ড) প্রতি বছর বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দিবস, বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবসসহ বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।
ঢ) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার যমুনার চরাঞ্চলগুলোকে নিয়ে পাখিদের একটি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলছে।
ন) এই সংগঠনটি বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (বিবিসিএফ) এর সদস্য সংগঠন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

মহান স্রষ্টার মহা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হচ্ছে এই সুন্দর পৃথিবী। পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় 'সৃষ্টির সেরা জীব' হিসাবে মর্যাদার দাবীদার মানুষের একটি অংশের অবিবেচনা প্রসূত কর্মকান্ডের কারণে বন্যপ্রাণীর অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে এবং অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। এভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার দায় যেমন মানুষের তেমনি তা রক্ষার দায়িত্বও মানুষেরই। এই মহান দায়িত্ব পালনে বগুড়ার গাবতলি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কমিটি অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই আসুন আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২' মেনে চলি এবং বন্য পশু ও পাখি শিকার, হত্যা ও ক্রয়-বিক্রয় করা থেকে বিরত থাকি ও অন্যকে বিরত রাখি।

প্রয়োজনে :
ফজলে বারী রতন ০১৭১৬১৩১৬১৮
রফিকুল ইসলাম ০১৭১২৪৩৭২৬৭
ছরোয়ার মোর্শেদ নয়ন ০১৭১৬৪৩৯২৩২
যোগাযোগ
প্রধান কার্যালয়
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কমিটি
গ্রাম: জয়ভোগা
পোষ্ট : গাবতলি
উপজেলা : গাবতলি
জেলা : বগুড়া-৫৮২০
ফেসবুক আইডি : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কমিটি
ই-মেইল: wccgabtalibogra@gmail.com

বিশ্ব নাগরিক হয়ে ওঠার চেতনাবোধ সম্প্রসারিত হোক ও জাগ্রত থাকুক সবার মাঝে

বিধানচন্দ্র পাল*

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতি তীব্র হচ্ছে। আর এই ক্ষতির সঙ্গে এখনই বাংলাদেশের মতো দেশগুলো খাপ খাওয়াতে পারছে না। এই শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা দেড় থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে এই ক্ষতি আরও বাড়বে। ফলে বাংলাদেশের জন্য সামনে আরও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে যাওয়াসহ নানা ধরনের বিপদ অপেক্ষা করছে। আর তাই জাতিসংঘের জলবায়ু তহবিলসহ নানা খাত থেকে বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য তহবিল বাড়াতে হবে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিজ্ঞানীদের প্যানেল-আইপিসিসির গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে এসব আশঙ্কা ও সুপারিশ করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে আমরা উদ্বিগ্ন বর্তমান সময়ের এবং আমাদের ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে। কিন্তু ইতিহাস খুঁজে দেখলে জানা যায় যে, পৃথিবীর কয়েক শত কোটি বছরের ইতিহাসে বারবারই জলবায়ু পরিবর্তন ঘটেছে। ছোট-বড় বিভিন্ন আকারে এটা ঘটেছে। এই পরিবর্তনের কয়েকটি আবার পৃথিবীকে প্রাণের উপযোগী করে তুলতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। যেমন: পৃথিবী গড়ে ওঠার সময়কালে বায়ুমন্ডলে প্রাকৃতিকভাবে উচ্চমাত্রার কার্বন-ডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প ছিল বলে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে সেখানে পানি তরল হিসেবে থাকতে পেরেছে। মঙ্গল গ্রহের মত সব বরফে পরিণত হয়ে যায়নি। যদি হতো তা হলে এটিও প্রাণহীন গ্রহে পরিণত হয়ে যাবার আশংকা ছিল। আবার প্রাকৃতিকভাবে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মেঘ এসিড বৃষ্টি হয়ে নেমে এসে কার্বনেট শিলায় এর কার্বন বাধা পড়েছে বলে অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে যেতে পারেনি ভূপৃষ্ঠ। তা না হলে এটি শুক্র গ্রহের মতো প্রাণহীন উত্তপ্ত গোলকেও পরিণত হয়ে যেতে পারতো। কাজেই যে প্রক্রিয়াটির কথা নিয়ে, যে পরিবর্তনটি নিয়ে আমরা এত উদ্বিগ্ন পৃথিবীতে সেটা আসলে নতুন কিছু নয়।

নতুন কিছু কী তাহলে? নতুন কিছু হলো আমাদের নিজেদের সৃষ্ট ঘটনা। যা সম্পূর্ণই নতুনকিছু, যা সমস্যা সৃষ্টি করছে এবং আমাদের ভবিষ্যতকে বিপর্যস্ত করছে। বিশেষভাবে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও জীবনযাপন পদ্ধতিকে বিগত সময়গুলোতে এমনদিকে ধাবিত করেছি যে তাতে বায়ুমণ্ডলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য আমরা বিনষ্ট করে ফেলছি। এর ফলে দেখা দিচ্ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া, যা ক্রমবর্ধমান হারে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি সৃষ্টি করে চলেছে। সবচাইতে বড় সমস্যা ও উদ্বিগ্ন হওয়ার বিষয় এখানেই। বর্তমান বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো- এটি মনুষ্য বা মানবসৃষ্ট।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত আইপিসিসির ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন, চরম খারাপ আবহাওয়া এবং ভূমি ও সাগরের যথেচ্ছ ব্যবহারের জেরে বিশ্বজুড়ে তীব্র খরা, দাবদাহ ও ঝড়ের সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে, যা মানুষ ও বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতির উল্লেখযোগ্য কারণ। আর এসব কারণে বিশ্বের ৩৩০ কোটি থেকে ৩৬০ কোটি মানুষ উচ্চ ঝুঁকির মুখে পড়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মানুষের জীবনের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব যত দ্রুত পড়বে বলে ধারণা করেছিলেন বিজ্ঞানীরা, তার চেয়েও দ্রুত এর অভিঘাত দেখা যাচ্ছে। এমনকি দেশগুলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কমিয়ে আনা ও কার্বন নিঃসরণ কমাতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে এখনো কার্যত সফল হয়নি। এর ফলে কৃষি, বন, মৎস্য, জ্বালানি, পর্যটনসহ বিভিন্ন খাত সরাসরি ক্ষতির মুখে পড়েছে।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আমরা দেখেছি, এই শতাব্দীর প্রথম ২১ বছরে বিশ্বের তাপমাত্রা ১.১ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। এর মানে সামনের ৭৯ বছরের মধ্যে তাপমাত্রাকে দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়তে দেওয়া যাবে না। এটা আসলেই বেশ কঠিন কাজ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ পর্যন্ত ১ ডিগ্রির বেশি তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় দুর্যোগ বেড়ে গিয়েছে সেইসাথে নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাবও আমরা টের পাচ্ছি। দরিদ্র দেশগুলো তো অবশ্যই উন্নত দেশগুলোর পক্ষেও এসব দুর্যোগ সামলানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। গত বছর (২০২১) আমরা দেখেছি জার্মানিতে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। কানাডার তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠে গিয়ে অনেক মানুষ মারা গেছে, দেশটিতে তীব্র বন্যাও আমরা লক্ষ্য করেছি। যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানছে। আর বাংলাদেশ, ভারত ও চীন তো প্রতিবছর রেকর্ড ভাঙা বন্যার মুখে পড়ছে। এ সবকিছু যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে হচ্ছে, তা বিজ্ঞানীরা আগের চেয়ে আরও বেশি যুক্তি প্রমাণসহ উপস্থাপন করতে পারছেন এখন।

আর এখন জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হলো এটি সরলরেখায় চলছে না। এর মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু চক্রবৃদ্ধির বিষয়। শুরুতে অল্প বৃদ্ধি অন্য আরো বড় বৃদ্ধির সুযোগ করে দিচ্ছে যা ঠিক কী হারে তার হিসাব করা দুরূহ। কাজেই পরিস্থিতি কিছুটা

*সদস্য, নির্বাহী পরিষদ, নগর গবেষণা কেন্দ্র (সিইউএস, ঢাকা) এবং প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রভা অরোরা

অনিশ্চিতভাবেই দ্রুত বদলে যাচ্ছে, যে কোন সময় আরো বদলে যেতে পারে। এজন্য সাম্প্রতিকতম উপাত্ত না পেলে অবস্থার পুরো গুরুত্ব তুলে ধরা কঠিন হচ্ছে। এখন তাই এই চক্রবৃদ্ধির প্রকৃতিগুলো আরো ভালোভাবে বোঝার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

তবে বিভিন্ন দৃশ্যকল্প এবং জলবায়ু মডেল থেকে একটি বিষয় খুব সুস্পষ্ট যে, এ সম্পর্কে আমরা যাই করি না কেন পুরো পৃথিবীর সবাই মিলেই করতে হবে, কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ ব্যাপারটা পুরো পৃথিবীকে নিয়েই। আমাদের একটিই পৃথিবী, একে বাঁচাবার দায়িত্বটিও আমাদের হাতেই। সামাজিকভাবেও এটি আমাদের সবাইকেই করতে হবে। বাঁচবার পথ একটিই- গ্রীন হাউস গ্যাস উদগীরণ কমাতে হবে, বহুলাংশে কমাতে হবে এবং তা যত দ্রুত সম্ভব করতে হবে। এর প্রধান গুরুত্বটি দিতে হবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদগীরণের ক্ষেত্রে। তারপরেই আসে মিথেন উদগীরণের প্রশ্নটি। যদিও বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, কৃষি খাত থেকে প্রচুর মিথেন গ্যাস নির্গত হয়। কার্বন নিঃসরণের চেয়ে মিথেন গ্যাসের বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ২৪ গুণ বেশি। বিশ্বজুড়ে ধ্বংস হওয়া বন, জৈব বর্জ্য, আবর্জনা থেকে শুরু করে পানিতে ডুবিয়ে রাখা ধান বা অন্য কোনো ফসল থেকে মিথেন গ্যাস নির্গত হয়। এরপর নাইট্রোজেন অক্সাইড, সিএফসি ইত্যাদি আরো কিছু গ্রীন হাউস গ্যাসের প্রশ্নও আসে, যদিও তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বে। আর বিভিন্ন গবেষণা থেকে এটাও প্রমাণিত যে, গ্রীন হাউস গ্যাস উদগীরণ বন্ধ করার বিষয়টি আমাদের পুরো আচরণ, অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং জীবন-যাপনের ভঙ্গির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে সংশ্লেষিত। আর এই সবকিছুতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার মাধ্যমেই কেবল পৃথিবীকে বাঁচানোর পথটি সুপ্রশস্ত হতে পারে।

বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের দ্বারাই সৃষ্ট। এর প্রতিকার শুধু বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের ওপর কিংবা দেশের সরকারের ওপর এককভাবে নির্ভর করে না। এখনো এর প্রতিকার করার সুযোগ আমাদের হাতে রয়েছে। পৃথিবীর সকল মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাস ও জীবনযাত্রার উপরেই তা অনেকখানি নির্ভর করে। তাই প্রকৃত অর্থেই ভবিষ্যৎ আমাদেরই হাতে। এর প্রতিকার করতে না পারার অর্থ হলো নিজেদেরকে অথবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনিশ্চয়তা ও চরম দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দেওয়া।

এ প্রতিকারের পথে একদিকে জলবায়ু সম্মেলনের (কপ-২৬) প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন: তাপমাত্রা বৃদ্ধি দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখা, প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের রূপরেখা অনুসারে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা, ক্লাইমেট প্যাক্টের ঘোষণার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ইত্যাদি খুবই জরুরি হবে। এসব ক্ষেত্রে দেশের সরকার অগ্রগামী ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে এবং করতে সচেষ্ট থাকবে- সেটাই আন্তরিকভাবে প্রত্যাশিত।

অন্যদিকে আমাদেরকে পথ দেখাবে, উদ্বুদ্ধ করবে এবং সাহস যোগাবে আমাদের সচেতনতা এবং আমাদের জ্ঞান। এজন্যই জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতার কথা ভাসা ভাসা শুনলেই হবে না। এর পেছনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা, নতুন নতুন উদ্ভাবন ও উদঘাটনগুলো কী নতুন কী হচ্ছে কিংবা হতে যাচ্ছে- সেসব কিছুই আমাদেরকে অনুধাবণের প্রচেষ্টা সবার দিক থেকেই থাকতে হবে। আর তা হলেই আমরা বুঝতে পারব আমাদেরকে এখন কি করতে হবে এবং কতটুকু করতে হবে। মজার ব্যাপার হলো এই করার মধ্যে শুধু যে ত্যাগের ও বর্জনের বিষয় আছে তাই নয়, বরং পরিবেশের সঙ্গে একটি সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি এবং জীবনযাত্রাকে আরও সুন্দর এবং উপভোগ্য করে তোলার বিষয়ও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত আছে।

পরিশেষে, আমরা সারা বিশ্বের মানুষ একসাথে সম্মিলিতভাবে সকল মানুষের জীবনযাত্রাকে সুন্দর ও স্থায়িত্বশীল করতে প্রয়াসী এবং তা করতে পারব- এই উপলব্ধি আমাদের ভেতরে বিশ্ব নাগরিক হয়ে ওঠার মতো একটি চেতনাবোধের জন্ম দেয়। এই চেতনাবোধ ধীরে ধীরে ব্যক্তি থেকে সমাজে, দেশ থেকে অন্য দেশে নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রসারিত হোক এবং জাগ্রত থাকুক- সেটাই একান্ত প্রত্যাশা হবে- সেটাই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অন্যতম সহায়কের ভূমিকা পালন করবে বলেই আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি।

আমাদের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও গ্রীস্মের তাপদাহ

মো আজহারুল ইসলাম খান*

জনজীবন আজ বিপর্যস্ত। ঢাকা মহানগরে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা নগরায়নের কারণে আজ আমাদের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। যেখানে বিশ্বের সব উন্নত নগরীতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষের আচ্ছাদন তৈরী করা হয় যার ক্যানপিতে গড়ে ওঠে একটি শ্যামল স্নিগ্ধ শহর কিন্তু আমাদের শহরে নতুন রাস্তা, হাউজিং,স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি দপ্তর তৈরি করতে যেয়ে প্রতিবছরই কেটে ফেলা হচ্ছে বহু বছর ধরে বেড়ে উঠা বৃক্ষ। যেখানেই উন্নতির ছোঁয়া লাগছে সেখানেই বৃক্ষনিধন এ কেমন সভ্যতা! এ কেমন উন্নতি! একবারও আমরা কেউ ভেবে দেখছি না এই বৃক্ষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে বিকল্প কোন পথ বের করা যায় কিনা।

আমরা আজ বিশেষ হুমকির সম্মখীন কেননা বৃক্ষনিধন করে আমরা নিজেরাই আমাদের বিপদ ডেকে আনছি। ঢাকা শহরে ইট, পাথর, ধাতবপাত, এলোমেনিয়াম ও কাঁচের তৈরি সুউচ্চ ইমারতগুলোতে সরাসরি সুর্যালোক পড়ে প্রচণ্ড ভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে আমাদের পরিবেশ। যে কোন এলাকার প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে দরকার সবুজ শ্যামল পরিবেশ আর এই ধরনের পরিবেশের প্রধান নিয়ামক হলো উদ্ভিদরাজি ও জলাধার। আমাদের দেশে আমরা সামান্যতম একটি জলাধারকেও ভরাট করে নগর নির্মান করছি কিন্তু একবারও ভেবে দেখার চেষ্টাও করছি না যে সৃষ্ট তাপমাত্রা কীভাবে শোষিত হবে। আর জলাধার না থাকার কারণে মাটি শুকিয়ে যাচ্ছে ফলে যা কিছু উদ্ভিদ আছে সেগুলোও আজ বিপন্ন প্রজাতিতে পরিণত হওয়ার উপক্রম।

আমাদের যে কয়টি হাইওয়ে আছে যদি চলার পথে একটু নজর দেওয়া যায় তাহলে ভয়াবহ চিত্র চোখে পড়ে। রাস্তার দু'পাশের সবুজ গাছপালাগুলো হঠাৎ কঙ্কাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এর কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে দেখলাম কে বা কারা সারা শহরের বর্জ্য রাস্তার পাশে এইসব গাছের গোড়ায় ফেলছে একসময় রাস্তার পাশে বিশালাকার বর্জ্যের পাহাড় সৃষ্টি হয়ে রাস্তায় Vasoconstriction হচ্ছে এমতাবস্থায় কোথা হতে যেন কিছু বান্ধব এসে জমাকৃত বর্জ্যের স্তুপে দাহ্য পদার্থ ঢেলে অগ্নি সংযোগ ঘটিয়ে রাস্তার Vasodilation করে পথচারীদের বিশেষ উপকার করছেন। ফলশ্রুতিতে সব সবুজ শ্যামল জ্বলে পুড়ে ছাড়খার। এক সময় দেখা যায় এর আশে পাশে ছোট্র একটা কুঠির উঠিয়ে জনকল্যাণে নিয়োজিত হয়েছেন কিছু মানুষ। হায়রে আমাদের পরিবেশ প্রতিবেশ...!!

ধ্বংস হলো সেই এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ। এইসব সুউচ্চ বৃক্ষে বসবাসরত প্রাণীকুল বিপন্ন হলো আর এই সব প্রাণীকুলের উপর যে সকল ছোট ছোট প্রাণীরা নির্ভরশীল তারাও নিঃশেষ হলো আর রইলো বাকি মনুষ্যকুল। ধ্বংস হলো ফুড চেইন পরিণামে মানুষের রোগব্যাধি দিন দিন বেড়েই চলছে। ফুড চেইন ধ্বংসের কারণে কিছু কিছু বিশেষ প্রজাতির পোকামাকড় মৌমাছি প্রজাপতি বিপন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে উদ্ভিদের পরাগায়ন সঠিকভাবে না হওয়াতে অঞ্চল ভেদে কিছু প্রজাতির ঔষধি উদ্ভিদ নিঃশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। এহেন পরিস্থিতিতে এমন একটা সময় আসবে যখন আমাদের নতুন প্রজন্ম প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকার কারনে সামান্য সর্দি জ্বর হয়ে পটল তুলতে যাবে। কেননা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারানোর ফলে যত্রতত্র এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে করতে একসময় সব কিছুই রেজিস্টেন্ট হয়ে যাবে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি আমরা দেখে যেতে পারবো কিনা জানি না তবে এই ভেবে গা শিহরিয়ে ওঠে আমরা আমাদের আগত প্রজন্মের জন্য কী রেখে যাচ্ছি!

আমার ছেলেবেলায় আষাঢ় মাসে ধান ক্ষেতের আলে উনিয়া(উইন্যা হলো বাঁশের তৈরি মাছ ধরার যন্ত্র) পেতে ও জলাধারে পলো দিয়ে যে পরিমাণ মাছ ধরেছি আজকাল তা কল্পনা করা যা না। আমাদের অনেক জলাশয়ের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এইসব জলাশয়ে প্রাণ নিয়ে কোন প্রানী বেঁচে থাকতে পারে না। উদাহরণ তো আমাদের বুড়িগঙ্গা নদী। তাহলে বলুন আমাদের নতুন প্রজন্ম কই পাবে সেই দারকিনা মাছ শরপুটি মাছ? তাহলে কি ভাবে রোগ প্রতিরোধক্ষম জাতি গঠন হবে? সময় এসেছে ভেবে দেখার, সময় এসেছে সবুজ শ্যামলকে রক্ষা করার।

Biodiversity, Ecology, Ecosystem Habitat ইত্যাকার নানা শব্দ আমাদের ভাষার জগতে খুব চালু আছে। প্রতিবছর বসে বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন। Bio-diversity রক্ষার্থে পাস করা হয় নানা আইন কানুন। কিন্তু মুনাফাখোর এই পুঁজিবাদী সমাজে তা কার্যকর করা খুব কঠিন হয়না। সবুজ বিপ্লবের নাম দিয়ে ধ্বংস করা হয় প্রাণিবৈচিত্র্য। এ রকম একরৈখিক উন্নতি আমার মত অতি অল্প জ্ঞানেই ধরে নেওয়া যায় এটা ভাল এটা খারাপ বা ব্যবসার খাতিরে ঢালাওভাবে Monoculture মোটেও সুখকর নয়।

আবার কেউ কেউ আছেন যারা এসব নিয়ে দার্শনিকভাব ও তৎপরতায় সোচ্চার। "সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্ত" এমন বাণী দ্বারা জগৎজোড়া আলোড়ন তুলেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। কই আমরা কি মেনেছি এই বাণী? চলুন এই ধরিত্রীর আশ্রয়ে থেকে সবুজ শ্যামলের ভালবাসায় জীবজন্ম সুখময় করে তুলি

*ম্যানেজার, ইন্সটিটিউট বিজনেস, রেনাটা লিমিটেড

রংপুরের নদী, তোমরা কি কোন কথা কও?

মোঃ রাইহান হোসেন*

তিস্তা-করতোয়া অববাহিকায় অবস্থিত উত্তরের এক ঐতিহাসিক জনপদ রংপুর। তিস্তার নদীবিধৌত এই অঞ্চলের রয়েছে প্রাণ ও জীবিকার সুদীর্ঘ এক ইতিহাস। অপার সম্ভাবনাময় রংপুর এক কৃষিনির্ভর এলাকা। এ অঞ্চল শিল্প তথা কৃষিশিল্প স্থাপনের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। রংপুরকে বলা হয় উত্তরের খাদ্যভাণ্ডার। এখানে ধানের পাশপাশি আলুসহ নানা ধরনের সবজি উৎপাদন হয়। এ অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশের সুবিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। সমগ্র রংপুর জেলায় জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য নদী। রংপুরের প্রাচীন রেকর্ড থেকে জানা যাচ্ছে, ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিস্তা-করতোয়া অববাহিকায় যে ভয়াবহ বৃষ্টি ও বন্যা হয়েছে, সেটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ঘটনা হয়ে আছে। ওই বছরের ২৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি একনাগাড়ে চার মাস চলেছিল। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল বর্তমান সময়ের যমুনা নদী। তিস্তার ওই প্লাবনের ফলে বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের (বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা) অনেক নদ-নদীতে পরিবর্তন ঘটে। প্রকৃতির এই অস্বাভাবিক আচরণে রংপুর বিভাগের তিস্তা-করতোয়া অববাহিকার ব্যাপক অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়। রংপুর শহরের পানিনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর সরকারি নথিপত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রংপুর ছিল অস্বাস্থ্যকর, নিচু জলাশয় আর ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ একটি শহর। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা অরবিন্দ ঘোষের পিতা ডা. কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন তৎকালীন রংপুর জেলার সিভিল সার্জন। তিনি রংপুর শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করার উদ্দেশ্যে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে নিজ উদ্যোগে সাত মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন করেন। খালটি উত্তরের চিকলি ও কুকরুল বিল এবং শহর থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে ঘাঘট নদের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এর ফলে ওই বিল দুটির অতিরিক্ত পানি এবং শহরের যাবতীয় তরল বর্জ্য এবং অতিরিক্ত আবদ্ধ পানি নির্গমনে সহায়ক হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে রংপুরে কর্মরত কালেক্টর মিস্টার স্ক্রাইন উদ্যোগ গ্রহণ করে শহরে আরেকটি খাল খনন করালেন। প্রথম খালটির নাম ঘোষের খাল এবং দ্বিতীয়টি স্ক্রাইনি খাল নামে পরিচিত। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে এই দুই খালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরবর্তী সময়ে ঘোষের খাল পুনঃখননের পর সেটি শ্যামাসুন্দরী খাল নামে পরিচিতি পায়। ডিমলার জমিদার এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রংপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান জানকীবল্লভ সেনের মায়ের নামে খালটির নাম রাখা হয়। ঘোষের খালটির উত্তরপূর্ব দিকের অংশটি বর্তমানে কেডি খাল নামে পরিচিত। শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত খালগুলো চলমান থাকায় রংপুর শহরে জনস্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়।

১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের যে পঞ্চবার্ষিক জরিপ হয়েছিল, তাতে রংপুর শহরকে সরকারিভাবে সমগ্র বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর শহর হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। পরিসংখ্যানে উল্লেখ রয়েছে, ১৯০৮ সালে পুরো বঙ্গ প্রদেশের শহরগুলোতে প্রতি বর্গমাইলে বার্ষিক মৃত্যুর গড় হার ছিল ২৪ দশমিক ১ জন। আর রংপুর শহরে প্রতি বর্গমাইলে যা ছিল ১৯ দশমিক ৯ জন।
(সূত্র: Eastern Bengal and Assam District Gazetteers, Rangpur, 1911, p.10, 49,150)

*সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়

রংপুর শহরে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম প্রবাহ মিলে মোট সাতটি নদী ও খাল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক প্রবাহ বা নদ-নদী হলো ঘাঘট, খোকশাঘাঘট, ইছামতী, বুরাইল ও আলাইকুমারী। কৃত্রিম প্রবাহ দুটি হচ্ছে শ্যামাসুন্দরী ও কেডিখাল। পানি নির্গমনের এত বেশি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা বাংলাদেশের অন্য কোনো জেলা শহরে নেই। রংপুর শহরের পানি নির্গমন ব্যবস্থাপনা ষোলো আনা ভেঙে পড়েছে। বাংলাদেশে এর কারণ খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না। বাংলাদেশের প্রতিটি মহানগর, জেলা ও উপজেলা শহরগুলোর মধ্য দিয়ে কিংবা আশপাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কোনো না কোনো নদী বা খাল। শহরের যাবতীয় তরল বর্জ্য ছোট বড় নর্দমা ও খালের মাধ্যমে নদীতে গিয়ে পড়ছে। এই নদ-নদীগুলো আগের চেহারায় এখন আর নেই। বাংলাদেশের এক সময়ের বহতা অধিকাংশ নদ-নদীর তলদেশ ভরাট হয়েছে এবং ভরাটের পর্যায়ে রয়েছে। ফলে এগুলোর এখন আর ক্ষমতা নেই হঠাৎ করেই বৃষ্টি বা বন্যার অতিরিক্ত পানি ধারণ করার।

রংপুর শহরের পানি নিস্কাশন ব্যবস্থার যে চিত্র, একই অবস্থা বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি শহরের। এটি এক দিনে ঘটেনি। উন্নয়ন আর নগরায়ণের নামে বাংলাদেশের শত শত শহরবন্দরে কত নদ-নদী, খাল ও জলাভূমি ভরাট করে প্রকৃতিকে ভারসাম্যহীন করে ফেলা হয়েছে, এর সঠিক হিসাব আমাদের জানা নেই। এর পাশাপাশি বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে নদীর উৎসমুখ চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অপরিকল্পিত শত শত রেগুলেটর, স্লুইসগেট, ক্রস ড্যাম, রাবার ড্যাম ইত্যাদি স্থাপনা করে প্রবহমান নদীকে মেরে ফেলা হয়েছে। নগরায়ণ, শিল্পায়ন তথা উন্নয়নের নামে স্রোতস্বিনী নদ-নদী ভরাট করা হয়েছে। এরূপ অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড এখনো অব্যাহত রয়েছে। নগরায়ন ও শিল্পায়নের দোহাই দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে অবকাঠামো। এতে করে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে চিরায়ত প্রকৃতি-পরিবেশ এবং প্রতিবেশের জীবনীশক্তি।

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো স্রোতস্বিনী নদী বা খাল। প্রতিটি শহর বন্দর ঘিরে ছিল নদী, খাল, বিল হাওরসহ উন্মুক্ত জলাশয়। ছিল বুকভরে নিশ্বাস নেওয়ার মতো উন্মুক্ত প্রান্তর। সেই বাতাবরণ এখন আর নেই। উন্নয়নের লাগামহীন ঘোড়া ছুটে চলেছে অবিরাম গতিতে। আগের চেয়ে পানির ব্যবহার বেড়েছে অনেক গুণ। স্বাভাবিকভাবে শহরের মধ্যে নির্মিত পাকা নর্দমা দিয়ে তরল বর্জ্য প্রবাহের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। হঠাৎ করেই অতিবর্ষণ শুরু হলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জনজীবন প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে। শহরের পানি গড়িয়ে যেতে সময় নেয় কয়েক ঘণ্টা কিংবা দু-তিন দিন। নদী দূষণ, জলাবদ্ধতার পাশাপাশি রংপুর অঞ্চলের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো খরা প্রবণতা। কৃষিতে এর প্রভাবের ফলে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তার ওপর পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব সারা বিশ্বে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব অতি গভীর। বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার কারণে আমাদের কৃষি ইতোমধ্যেই বেশ চাপের সম্মুখীন। এর সাথে পরিবর্তিত জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব এটিকে আরও নাজুক অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কৃষির সাথে আবহাওয়া ও জলবায়ুর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বিশেষ করে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্ক আরও গভীর। জলবায়ুর ভিত্তিতেই কোনো এলাকার কৃষি-সংস্কৃতি গড়ে উঠে। প্রতিটি ফসলের জন্য নির্দিষ্ট সুবিধাজনক আবহাওয়াগত পরিস্থিতির প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহমান কালের চিরচেনা ঋতুর আবর্তন অনেকটা অনিয়মিত হয়ে গেছে, যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে আমাদের কৃষি সংস্কৃতির ওপর।

রংপুর অঞ্চল তেমন শিল্পপ্রধান না হলেও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে এখানেও। বিভিন্ন কৃষিপ্রধান শিল্প যেমন রাইস মিল, হিমাগারের পাশাপাশি নানা শিল্পকারখানা, ইটভাটা গড়ে উঠছে সময়ের দাবী মেটাতে গিয়ে। এদিকে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়নের ফলে বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। বায়ুদূষণের পাশাপাশি মাটিদূষণ, শব্দদূষণ এবং পানিদূষণও বাড়ছে একে অপরকে পাল্লা দিয়ে। তিস্তা আজ শুকিয়ে তার নাব্যতা হারিয়ে ফেলার উপক্রম, শ্যামাসুন্দরী আজ মরা খালে পরিণত হয়েছে। দখলে-দূষণে বিপর্যস্ত রংপুরের শ্যামাসুন্দরী খাল। ময়লা আবর্জনার ভাগাড় এখন এককালের স্বচ্ছসলিলা এ জলেধারা। তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় একটু বেশি বৃষ্টি হলেই উপচে পড়ে শ্যামাসুন্দরী। তৈরি হয় জলাবদ্ধতাও। মাটি ভরাটে এখন মৃতপ্রায় রংপুরের আরেক ঐতিহ্যবাহী শালমারা নদী। উন্নয়নের পিছু ছুটতে গিয়ে আমরা অরণ্যকে গ্রাস করে নগর গড়ছি। অথচ পরিবেশের এই সামগ্রিক বিপর্যয় মোকাবেলা করে উন্নয়নকে এগিয়ে না নিলে তা টেকসই হবে না। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, **'নদী, তুমি কোন কথা কও?'** সেখান থেকেই এ লেখার শিরোনাম। নদীর আক্ষরিক কোনো ভাষা না থাকলেও কারও কারও কাছে যেন নদীর ভাষা আছে। কবির পক্ষে হয়তো সেই ভাষা বোঝা সহজ। নদীর সেই কথা শোনা গেলে এক সময়ের স্রোতস্বিনী নদীর দূষণে পচে গলে যাওয়ার চাপাকান্না শুনতে পেত মানুষ।

পরিবেশ বাঁচাতে হবে মানুষের প্রয়োজনে

আফতাব চৌধুরী*

সুস্থ, সুন্দর পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে মাটি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের মত আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় প্রবেশ করার প্রাক্কালে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সে সৌন্দর্য্যের পূজারী প্রকৃতিবাদী কবি কাউপারকে (cowper) যার কণ্ঠে একদা ধ্বনিত হয়েছিল সে অমোঘবাণী God made the country and man made the town- সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেন দেশ আর মানুষ পত্তন করে নগরের। তাই দর্শন চিন্তায় আমরা দেখতে পাই প্রকৃতিকে মানুষ রচিত আইনের উর্দ্ধে এমন কি রাষ্ট্রের চাইতেও সার্বভৌম বলে গণ্য করা হয়েছে। একই চিন্তাধারা প্রতিফলিত করে অন্য এক মনীষী অত্যন্ত সাবলীল ভাবে বলেছিলেন সমগ্র বিশ্ব যেন এক অখণ্ড গ্রাম সমবায়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের নিরন্তর প্রয়াস উন্নয়ন অভিমুখী। উন্নয়নের প্রয়োজনে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশকে ব্যবহার করছে, চেষ্টা করছে তার উপর উত্তরোত্তর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে। মাটি, পানি, খনিজ সম্পদ, জলবায়ু, গাছপালা, জীব-জন্তু, ফল-মূল ইত্যাদি সবই এই প্রকৃতি ও পরিবেশের অন্তর্গত। এ কথা বাস্তব সত্য যে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন অনেক গুণ বেশি। তাই মার্কিন অর্থনীতিবিদ আর্থার লুইস সত্তরের দশকে উনয়নকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন, উনয়ন হচ্ছে মানুষের পছন্দ বা বাছাই করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এক সময় মানুষ পায়ে হেঁটে অথবা গাধা-ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতো। আজ রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ ইত্যাদির যে কোনটাতে সে কম সময়ে যাতায়াত করতে পারে দূরে কিংবা নিকটে। মানুষের এই যে পছন্দ বা বাছাই করার ক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা তা কেবল প্রকৃতি ও পরিবেশকে বিস্তৃত ও নিবিড়ভাবে ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব হচ্ছে। তাই মানুষের নিরন্তর উন্নয়ন প্রচেষ্টার আরেক নাম হচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা রকম ব্যবহার। অথচ আমরা জানি, প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রকৃতি ও পরিবেশ টিকে থাকে। মানুষের উন্নয়ন প্রচেষ্টা যদি এই নিয়ম ভঙ্গের কারণ হয় অথবা এই নিয়মে বাধা সৃষ্টি করে তখন পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। মানুষের জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ তখন প্রতিকূলে চলে যেতে পারে। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই যে নিকট অতীতে মানুষ প্রায় সব উন্নয়ন কৌশল ও কর্মসূচিসমূহে কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথাই চিন্তা করতো। প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর সে কৌশল ও কর্মসূচির কী প্রভাব পড়বে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাত না। আজ পরিবেশের কথা বিবেচনা করে উন্নয়নকে কীভাবে পরিবেশ সম্মত বা পরিবেশবান্ধব করা যায় সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। অন্য কথায় এমন উন্নয়ন কৌশল ও কর্মসূচির কথা বলা হচ্ছে যা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করলেও যতটুকু সম্ভব কম করবে যার ফলে এমন পরিবেশ বজায় থাকবে যা শুধু এই প্রজন্মের জন্য নয়, আগামী প্রজন্মের জন্যও থাকবে নিরাপদ ও অনুকূল।

পৃথিবীতে জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বাড়ছে খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিতে ব্যবহৃত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। শিল্পকারখানারও ব্যাপক প্রসার ঘটছে। এসবের সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও শিল্পবর্জ। যেখানে অন্য কোনো উৎস থেকে শক্তি আহরণ সম্ভব নয়, সেখানে পুড়ছে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি। ফলে বন উজাড় হচ্ছে, বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাসের মাত্রাও বাড়ছে। এসবের প্রভাব পড়ছে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর। বৃষ্টি কমছে, ভূমিধস বাড়ছে, মরুকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে, ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ছে, বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং বন্যা ও জলোচ্ছাসের ব্যাপকতা। তবে মনে রাখা দরকার যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বহুবিধ কারণও এই সার্বিক আত্মঘাতী প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর উন্নয়ন কার্যক্রমের বিরূপ প্রভাবের এই প্রক্রিয়াটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

শিল্পকারখানা, যানবাহন ও অন্যান্য উৎস থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, বিভিন্ন প্রকার শিল্পজাত পণ্য ও রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন, শিল্পবর্জ্য, কয়লা ও তেলের মত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কারণে কার্বনডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস-অক্সাইড গ্যাস সমূহের অনুপাত বাতাসে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বাতাসে এসব গ্যাসের আধিক্যের সরাসরি শিকার হচ্ছে বৈশ্বিক জলবায়ু। ধারণা করা হচ্ছে যে, প্রচুর

*সাংবাদিক ও কলামিস্ট

গ্রীন হাউস গ্যাস বাতাসে জমা হওয়ার ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা বিগত অর্ধ শতাব্দীতে প্রায় ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির ২০০০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১০ সাল পর্যন্ত বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রাক-শিল্পযুগের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি এবং বর্তমান পদ্ধতি ও হারে জ্বালানি ব্যবহার অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বের এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির পিছনে শিল্পায়িত উন্নত বিশ্ব মূলত দায়ি হলেও এর কুফল কিন্তু উন্নত ও অনুন্নত সব দেশকেই কম-বেশি ভোগ করতে হবে। বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে অনাবৃষ্টি, মরুকরণ, বন উজাড়করণ, ভূমিধ্বস ইত্যাদি আরও বেড়ে যাবে। ফলে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে কৃষির উপর নির্ভরশীল গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর যারা বাঁচার তাগিদে অনন্যোপায় হয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশকে আরো ব্যাপক ও নিবিড়ভাবে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতাকে বাড়িয়ে তুলবে। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির আরো একটা ভয়াবহ কুফল হরো সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি যা ইতোমধ্যে

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুভূত হচ্ছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে বিশ্বের অনেক নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাবে যার ফলে অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ, জীব-জন্তু এমনকি মানুষের আবাসস্থলও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানুষের তৈরি বিভিন্ন গ্যাস যেমন-সাল-ফারডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন-অক্সাইড ইত্যাদি বাতাসের সংস্পর্শে আসার ফলে অম্ল বা এসিড তৈরি হয় যা পরে অম্লবৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই অম্লবৃষ্টি প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতি সাধন ছাড়াও মানবদেহ, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। তবে স্বস্তির বিষয় এই যে, বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমস্যাবলী এখনও প্রকট আকার ধারণ করেনি। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে আমরা এই সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরাপদ দূরত্বে আছি। কেননা একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যাবে যে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। গত ২০ বছরে বাংলাদেশ প্রায় ১ কোটি লোক নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার ২০১৬ সালের ২০ শে জানুয়ারি সংখ্যার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুষ্ক মৌসুমের শুরুতে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীসমূহের পানির উচ্চতা আংশকাজনকভাবে হ্রাস পাওয়ায় নৌচলাচল, সেচ ও মৎস্য উৎপাদনে দারুণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। নদীর গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় বর্ষাকালে বন্যার তীব্রতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দীর্ঘ সময়ে সংঘঠিত প্রধান প্রধান বন্যায় বাংলাদেশে হাজার হাজার বর্গমাইল এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বাংলাদেশে নির্মাণ ও যাতায়াত খাত শিল্পকারখানা স্থাপন, বাসস্থান নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন ইত্যাদি প্রসারের সাথে সাথে ইটের চাহিদাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নতুন নতুন ইটখোলা সৃষ্টি হচ্ছে যা একদিকে চাষয়োগ্য জমি ও উর্বর মাটি নষ্ট করছে, অন্যদিকে ইট পোড়াতে প্রচুর কাঠ ব্যবহারের ফলে বন-জঙ্গল উজাড় হচ্ছে, ইটের ভাটার কালোা ধোঁয়া পরিবেশ দূষণে অবদান রাখছে। অথচ আমরা জানি, বন উজাড়করণের ফল খুবই মারাত্মক। কেননা এর ফলে বৃষ্টিপাত কমে যায়। ভূমিধ্বস বাড়ে, মাটির নিচের পানির স্তর নেমে যায়, মাটির পানিধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায় ও উর্বরতা নষ্ট হয়। তাছাড়া, রাজধানীসহ বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে যানবাহন থেকে নির্গত কালোধোয়ায় বায়ু দূষণের মাত্রা আংশকাজনক পর্যায়ো পৌঁছেছে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করছেন।

উন্নয়নের নামে ভূমি ও পানির মতো মৌলিক প্রাকৃতিক উপাদানকেও মানবজাতি কীভাবে যে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তার বর্ণনা দেওয়া সত্যিই দুরূহ। বাড়তি জনসংখ্যার আবাসনের জন্য একদিকে চাষযোগ্য জমি, পাহাড় ইত্যাদি রূপান্তরিত হচ্ছে মানুষের আবাসস্থলে, অন্যদিকে সবুজ বিপবের নামে ভূমি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির যেমন সেচ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে মাটির নিচের পানির স্তর বিশেষ করে গভীর/অগভীর নলকূপ ব্যবহারের কারণে ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পানি দূষিত হচ্ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী বিভিন্ন প্রজাতির পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ বিলুপ্ত হচ্ছে, দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির ফসলের মিশ্র চাষের পরিবর্তে বার বার একই প্রজাতির উচ্চ ফলনশীল ফসল ব্যবহারের ও উৎপাদনের কারণে জমির উর্বরতা ও কৃষির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে।

এদিকে অতীতে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য উন্নয়ন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বে যে বড় বড় পানিধারা ও বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে তার প্রভাব এখন মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। কেননা এসব উচ্চাকাঙ্খী বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণের ফলে একদিকে কোটি কোটি

মানুষ গৃহহারা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ একর চাষযোগ্য জমি পানির নিচে ডুবে গেছে। অন্যদিকে ভুমিধ্বস, বন উজাড়করণ, মরুকরণ, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে জীববৈচিত্র্যে পড়েছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং প্রকল্প এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও এসেছে ব্যাপক অশুভ পরিবর্তন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত ফারাক্কা বাধঁ বাংলাদেশের উপর কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তা আজ সবারই জানা। উন্নয়নের নামে মানব সৃষ্ট কর্মকাণ্ড প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করা ছাড়াও বহুবিধ অর্থনৈতিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। আশার কথা বাংলাদেশে ইদানীংকালে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ু দূষণকারী ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, ডিজেল ও পেট্রোলের পরিবর্তে সিএনজি গ্যাসের ব্যবহার, বেবিটেক্সী, টেম্পো ইত্যাদি যানবাহনের আমদানি নিষিদ্ধকরণ, বনায়ন বৃদ্ধি ও পাহাড়কাটা রোধকরণ, বুড়িগঙ্গাসহ বিভিন্ন নদী দখল ও দূষণকারী স্থাপনা উচ্ছেদকরণ ইত্যাদি এই সচেতনতা বৃদ্ধির পরিচায়ক।

সুতরাং আমার এখন বুঝতে পেরেছি পরিবেশ বাঁচাতে হবে মানুষের প্রয়োজনেই।

নদী সত্তায় আগামীর বাংলাদেশ

ফাতেমা-তুজ-জোহরা*

নদীমাতৃক দেশ আমাদের বাংলাদেশ। রমণীর চুলের বেণী মত বঙ্গমাতার বুক জুড়ে শিরা-উপশিরার ন্যায় প্রবাহমান নদনদী। আবহমান বাংলায় একসময়ে ৭০০-১২০০ নদ-নদীর কথা শোনা গেলেও কালের পরিক্রমায় এখন নদ-নদীর সংখ্যা ৪০৫-এ (সূত্রঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রিপোর্ট, আগষ্ট ২০১১) গিয়ে দাঁড়িয়েছে! এবং তন্মধ্যে আবার অনেক নদীই মৃতপ্রায়! পার্থিব উন্নয়নের স্বর্ণশিখরে আরোহণের নেশায় নদীকে গ্রাস করে, দূষিত করে, নদীর উপর নির্ভরশীল প্রতিবেশের কথা চিন্তা ব্যতিরেকেই নদীর বাস্তুসংস্থান নষ্ট করে যে আমরা অনিশ্চত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তা হয়তো কখনো আমাদের মনে নাড়াও দেয় না! ফলশ্রুতিতে অনেক সময়ই দেখা যায়, নদীমাতা তাঁর সন্তানের কাণ্ডে বিরক্ত হয়ে পাড় ভেঙ্গে, হাজার হাজার একর জমি নদী গর্ভে বিলিন করে, বন্যার পানি উপচে দিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখানোর মাধ্যমে তাঁর সন্তানকে দৈনতা ও বিশালতার শিক্ষা দিয়ে থাকে। তবে নদীর এরূপ বিরূপ আচরণের দিকে আমরা আদৌ কোন কর্ণপাত করছি কি? ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা হতে দেশের বৃহত্তম স্বার্থে নদীকে তাঁর চলার পথে বাঁধা সৃষ্টি করছি না তো!

অথচ, সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা নদীমাতৃক এই বাংলাদেশ হতে পারে নৌপথভিত্তিক উন্নত যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্বের বুকে এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ! দেশ এগিয়ে যাচ্ছে "উন্নয়নের মহাসড়কে", সেই মহাসড়কের একটি সড়ক হিসেবে যদি আমরা নৌপথকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারি, তবে যে চলমান উন্নয়ন বহুমাত্রিক রূপ নিবে সেটা নিয়ে বিন্দু সমতুল্য কোন সন্দেহ নেই। এখানে নদী বলতে শুধু নদীই নয় বরং এর সাথে মাছ, কীটপতঙ্গ, গাছ-পালা ইত্যাদিকেও যেমন বোঝানো হচ্ছে, ঠিক তেমনি নৌপথ বলতে কেবল নদীর পথ না বরং হাওর, বাওড়, খাল, বিলের মাঝ দিয়ে একেবেকে প্রবহমান নৌপথকেও বোঝানো হচ্ছে যার মধ্য দিয়ে মানুষ পারাপার হতে শুরু করে পণ্য পরিবহন করা হয়ে থাকে, যার উপর ভিত্তি করে বেঁচে থাকে লক্ষ লক্ষ পরিবার।

বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে, দেশের প্রায় ১৭ কোটি লোকের ৩৪ কোটি চোখ স্বপ্ন দেখলে যে এ দেশের অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য তারই প্রমাণ আমরা দেখেছি অনুপ্রেরণার শত উৎস হিসেবে পিছনে রেখে আসা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, যেখানে মাত্র নয় মাসে ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও অসংখ্য মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তাঁর ছোঁয়া বা সুফল পাচ্ছে দেশের সকল খাত-উপখাতসমূহ। ঠিক তেমনি এই ডিজিটাল বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নদ-নদীতে একদিন সড়কপথের ন্যায় নৌপথেও নৌকা, স্পিড বোট,ট্রলারে উবার-পাঠাওয়ের মাধ্যমে মানুষজন যাতায়াত করবে, বর্তমানে যেমন অনেকেই ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করে সড়কপথে যাতায়াতের জন্য, ঠিক তেমনি সবাই পরিবার নিয়ে চলাচলের জন্য ব্যাক্তিগত নৌকা বা স্পিড বোট রাখবে। আর এ স্বপ্ন সত্যি হলে এ পথ আরো জনপ্রিয় হবে কারণ, নৌপথের যাতায়াতের খরচ, সড়ক পথের থেকে অনেক সাশ্রয়ী। এখন দরকার শুধু যোগাযোগ ও যাতায়াতের সেই কাঙ্খিত পরিবেশটা নিশ্চিত করা, নদীর নাব্যতা নিশ্চিত করা।

খোয়াই নদী, হবিগঞ্জ

*পরিদর্শক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা কার্যালয়, ঢাকা

বর্তমানে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে যেখানে বর্তমানে জনপ্রতি মাথাপিছু আয় ২,৮১৪ মার্কিন ডলার (সূত্রঃ দ্যা ডেইলি স্টার, ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২)। ফলশ্রুতিতে, জীবনযাত্রায় সৌখিনতার অংশ হিসবে বিদেশ যাত্রা বা দেশের ভিতর সময় পেলে পরিবার নিয়ে রিসোর্ট বা অন্য কোথাও নিরিবিলি সময় কাটানোর সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে। নদীর বর্তমান অবস্থা অক্ষুন্য রেখে যদি আমরা নদীর আগের রূপ ফিরিয়ে দিতে পারি, তখন দেখা যাবে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া বড়-ছোট অসংখ্য নদ-নদীতে মানুষ তাঁর পরিবার নিয়ে নৌ-বিহারে সময় কাটাচ্ছে, দেশের পর্যটন এগিয়ে যাচ্ছে।

পদ্মা নদী, দোহার, ঢাকা

বিগত ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে মালদ্বীপ যেমন সমুদ্রের পানির নিচে বৈঠক করে দুনিয়াব্যাপী সাড়া ফেলে দিয়েছিলো, ঠিক তেমনি আমরা একদিন নদীর প্রবাহকে সচল রেখে সাতক্ষীরার কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাঝ নদীতে মিটিং আয়োজন করে বিশ্ববাসীকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সমস্যাসমূহ তুলে ধরার দাবি সোচ্চার করতে পারবো। সম্প্রতি বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুৎ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে, সকল ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এর আলো পৌঁছিয়ে এগিয়ে যাবার পথ দেখাচ্ছে। তেমনি নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন ৪জি হতে ৫জি'র দিকে ধাবমান। ফলশ্রুতিতে, মাঝনদীতে পালতোলা নৌকায় বসে দেশবিদেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কল্পনা এখন করতেই পারি আমরা।

অব্যবহৃত লোহাতেও পানি লেগে যেমন মরিচা ধরে, ঠিক তেমনি অধিক ঘর্ষণের ফলে কৃষকের কাচি আরো ধারালো হয়ে ক্ষুরধার হয়ে থাকে। নদী নৌপথকে আরো বেগবান করতে হলে আমাদেরকে এপথের যত্ন যেমন করতে হবে, ঠিক তেমনি নদীপথের অধিকতর ব্যবহারও তেমনি নিশ্চিত করতে হবে। স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি একদিন নৌকাতে বা স্পিড বোট ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড লাগিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যাতায়াত করবেন, আগের মত গ্রামে গ্রামে প্রবহমান নদীতে নৌকা বাইচের আয়োজন করা হবে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে চাই জনসচেতনতা

জিয়াউর রহমান লিটু*

আমরা যা কিছু শুনি তাই শব্দ। শব্দ এক প্রকার শক্তি। কিন্ত এই শব্দই যখন মাত্রারিক্ত হয় তখন তা দূষণে পরিণত হয়। কোন কিছু থেকে সৃষ্ট তীব্র শব্দ যখন অস্বাভাবিক মাত্রায় প্রবাহিত হয়ে শ্রবণশক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তাকেই শব্দদূষণ বলা হয়। শব্দদূষণ জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। শব্দদূষণ কারণে বধিরতাসহ হৃদকম্পন বেড়ে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপ, বমি বমি ভাব, মাথা ধরা, শ্বাসকষ্ট এবং আলসারের জন্য দায়ী। শব্দদূষণের কারণে শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং গর্ভবতী মায়েরা সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে থাকেন।

অপরিকল্পিত নগরায়ন, যান্ত্রিক যানবাহনের বৃদ্ধি, কল-কারখানা, নির্মাণ কাজ, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রচারণার কাজে ব্যবহৃত মাইক প্রভৃতি উৎস থেকে শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে যানবাহনের হর্ণই শব্দ দূষণের জন্য অধিক দায়ী। এজন্য রাস্তা-ঘাটে অবস্থানকারী ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা, রিকশাচালক, হকার এরাই বেশীরভাগ ক্ষতির সম্মুখীন হোন। এমনকি রাস্তার পাশে অবস্থিত হাসাপাতালের রোগী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

এই শব্দদূষণের জন্য আমরাও দায়ী। আমরা প্রতিনিয়ত সতেচনতার অভাবে বা শব্দদূষণ বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেয়ায় নিজের এবং প্রতিবেশীর ক্ষতি করছি। যেমন, সামাজিক অনুষ্ঠানে দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ শব্দে গান-বাজনা অনেক সময় প্রতিবেশীদের জন্য দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাড়ায়। বিশেষ করে কোন বাসায় পরীক্ষার্থী বা অসুস্থ ব্যক্তি থাকলে তাদের জন্য এক ধরনের বিপর্যয় নেমে আসে। মার্কেটগুলোতে উচ্চ শব্দে গান-বাজনা, সভা-সমাবেশে ব্যবহৃত মাইকের শব্দ জনজীবনকে অতীষ্ট করে তোলে। মাত্রাতিরিক্ত শব্দ শুধুমাত্র মানবজীবনেই নয়, জীববৈচিত্রের জন্যও হুমকির সৃষ্টি করছে। আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলেই এই শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

বর্তমানে শব্দদূষণ শুধুমাত্র নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এটি ছড়িয়ে পড়েছে। শব্দদূষণ প্রতিরোধ করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদেরকে ব্যাপক খেসারত দিতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী ৩০টি কঠিন রোগের কারণ ১২ রকমের পরিবেশ দূষণ যার মধ্যে শব্দদূষণ অন্যতম। শব্দদূষণের কারণে রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃদস্পন্দনে পরিবর্তন, হৃৎপিন্ডে ও মস্তিস্কে অক্সিজেন কমে যেতে পারে। এজন্য শ্বাসকষ্ট, মাথাঘোরা, বমি বমি ভাব, বমি হওয়া, দিক ভুলে যাওয়া, দেহের নিয়ন্ত্রণ হারানো, মানসিক ক্ষতিসহ বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা তৈরি করে।

বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ৫৬% নগরের বাসিন্দা এবং এই বৃদ্ধির হার ২.১৩%। বাংলাদেশে ৩৪% জনগোষ্ঠী নগরে বাস করে এবং এই বৃদ্ধির হার ৩.৬%। নগরের অধিকাংশ মানুষকে নিত্যদিন বাইরে যেতে হয় এবং শব্দের কারণে তাদের স্বাস্থ্য ক্ষতি হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটছে, মানুষের কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়। সর্বোপরি নগরে অল্প জায়গায় অধিক মানুষ বাস করে বিধায় শব্দদূষণের নেতিবাচক প্রভাব ব্যাপক। নগরে বাইরে অবস্থানকালীন সময় এবং সড়ক সংলগ্ন এলাকায় নাগরিকদের শব্দদূষণের ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষা প্রদান জরুরি।

শব্দদূষণের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আমেরিকান স্পীচ এন্ড হেয়ারিং এসোসিয়েশন (আশা) কর্তৃক গ্রহণযোগ্য শব্দের মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে। শব্দের মাত্রা নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফলতা দেখিয়েছে। বাংলাদেশেও শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ প্রণয়ন করেছে। যেখানে শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বিধিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন ও পালন শব্দদূষণের ক্ষতির হাত থেকে জনসাধারণকে সুরক্ষা দিতে পারে।

নগরায়ন, শিল্পের বিস্তার, প্রযুক্তির প্রসার, যান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবনধারণের প্রেক্ষাপট পরিবর্তনই শব্দদূষণের মূল কারণ। শব্দদূষণ শুধুমাত্র নাগরিক জীবনের সমস্যা নয়, এটি ধীরে ধীরে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সঙ্কট হিসেবে দেখা দিয়েছে। শব্দদূষণের প্রভাবে সর্বস্তরের জনগণ সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তবে ছাত্র-ছাত্রী, হাসপাতালের রোগী, ট্রাফিক পুলিশ, পথচারী এবং গাড়ির চালকরা শব্দদূষণের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শব্দদূষণ শিক্ষার্থীদের মেধার পরিপূর্ণ বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করছে। দেশ ও জাতি বঞ্চিত হচ্ছে বিকশিত প্রজন্ম পাওয়া থেকে।

আমাদের দেশে এ বিষয়ে সচেতনতার অভাবে দীর্ঘ সময় ধরে শব্দের উৎস বা কাছাকাছি অবস্থান করার ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এ বিষয়ে

*জোষ্ঠ্য প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

আরো ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে সর্বস্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। শব্দের মাত্রা সম্পর্কে অবহিত হয়ে সে অনুযায়ী ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে শিল্প-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের অভ্যন্তরীণ শব্দদূষণের ক্ষতি থেকে সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়াও নির্মাণ কাজ, যানবাহন ও সামাজিক অনুষ্ঠানজনিত শব্দের মাত্রা আশেপাশে কাদের উপর প্রভাব ফেলছে সেটি নিরুপন সাপেক্ষেও পদক্ষেপ নিতে হবে। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের নিয়মিত তদারকি এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের সচেতন করা এবং প্রয়োজনে শাস্তির প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচি (২০১৫-১৭) আওতায় দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে শব্দের মানমাত্রা পরিমাপ বিষয়ক একটি জরিপ করা হয়। জরিপের ফলাফল দেখা যায়, নির্ধারিত সবগুলি স্থানেই শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম করেছে। এ সকল স্থানে যানবাহন এবং এর হর্ন শব্দের উৎস প্রধান হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। উক্ত জরিপে দেখায় অনেক স্থানেই মাত্র ১০ মিনিটে ৫০০ থেকে ১০০০ বারের মতো হর্ন বাজাতে দেখা যায়। এছাড়া সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নির্মাণ কাজ এবং কলকারখানা থেকেও শব্দদূষণ সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানা গেছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য আমাদের যথেষ্ট আইন ও নীতিমালা রয়েছে। সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

তবে আইন, বিধিমালা যা-ই বলি না কেন, সর্বস্তরে শব্দ দূষণের ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করা না হলে সুফল পাওয়া যাবে না। সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই শব্দদূষণের মতো নীরব ঘাতককে রুখতে হবে। অর্থাৎ হর্ন বাজানো থেকে বিরত থাকা, সন্ধ্যার পর নির্মাণ কাজ না করা, শব্দ কম হয় সেরকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উচ্চ শব্দ এড়িয়ে চলা ইত্যাদি। শব্দদূষণ রোধে ও বিধিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারকে বিশেষ করে পরিবেশ অধিদপ্তরকে আরো জোরালো ভূমিকা পালক করতে হবে। সাধরণ মানুষের কাছে এর ক্ষতির বিষয়টি তুলে ধরতে ব্যপক প্রচার ও প্রচারণা করতে হবে। পরিশেষে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। আর সকলের সচেতনতার পরিবর্তনের মাধ্যমেই শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

English Articles

Regenerative Agriculture – An Important Restoration Tool of Climate Change Impacts in Bangladesh

Professor Dr. Md. Shafiqul Bari*

Bangladesh is facing serious challenges due to climate change impacts. Due to the world's largest river delta systems, flash floods, monsoon floods, landslides, cyclones, drought, storm surges, salinity, and unsure rain are the common hazards in Bangladesh. Currently Bangladesh ranked 9th among the countries most affected by climate change-induced natural disasters. As per the World Bank report, in the past 40 years, average GDP loss due to climate disasters has been from 0.5% to 1% annually. The Government of Bangladesh (GoB) already invests about Tk 25,000 crore, close to $3 billion a year, for addressing climate change impacts.

Besides this, another significant challenges that Bangladesh faces is ensuring the food availability of its increasing population. Therefore, we need to be more climate-resilient and have sustainable development, giving importance to soil health is crucial. Soil plays an essential role in absorbing atmospheric excessive carbon and filtering fresh water. But due to the deforestration, excessive uses of chemical fertilizer,and climate change, soil is degrading at an alarming rate. Chemical fertilizers, pesticides under subsidized rate, an extension of irrigation facilities, and mechanization, the country faces various challenges in sustainable agriculture development perspective.

However, Bangladesh has taken different methods, techniques, and tools to maintain sound soil properties, but a more effective step needs to be taken to make it sustainable. Under these circumstances, regenerative agriculture may be a good tool to cope it efficiently. But still the term Regenaration agriculture may not familiar to many people. But recently it has gained attention to several scientists and policymakers as an important tool for sustainable agricultural development in the globe. Indeed, Regenerative agriculture is a farming system that attempts to conserve soil and contribute to multiple provisioning, regulating, and supporting ecosystem services. Also it's main objectives are to improve the ecosystems, social conditions, livelihood status and economical stability for more food produce. Crop rotation, zero-till/ direct seeding, cover cropping, compost/ manure application, livestock integration, and agroforestry are considered regenerative agriculture.

Moreover, Regenerative agriculture is one type of Nature-based Solution (NbS) in agriculture sector. The actions which can protect, sustainably manage, and restore ecosystems that minimize community challenges efficiently and adaptively while simultaneously providing human well-being and biodiversity benefits is called NbS. Under the umbrella of NbS, different ecosystem-based approaches such as afforestration, social forestry, agroforestry practices, aqua-forestry and planned grazing are all Regenerative agriculture. These practices help in ecosystem restoration, ecosystem-based adaptation, mitigation, disaster risk reduction, integrated water resource management, and area-based conservation.

Despite being a densely populated nation prone to climate vulnerability, Bangladesh has already made various efforts to mitigate and adaptate climate change impacts. The country has already

*Department of Agroforestry and Environment, Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University, Dinajpur 5200, Bangladesh

taken steps to ensure food security under the changing climatic scenario. People of Bangladesh especially farmers have been practicing NbS for many years. Now a days, Bangladesh has implimenting several projects related to NbS like swamp forest restoration, coastal afforestation, floating agriculture, slope vegetation, hill farming, char land agroforestry, intensive and diversified cropping pattern, site specific crop rotation, and many more.

However, if the country is practicing NbS, why pay specific attention to regenerative agriculture? The answer is to achieve agriculture sustainability in the future. We urgently need to minimize the uses of excessive chemical fertilizer, pesticide, weedicide and plant hormone. This can only be ensured when we will follow Regenerative agriculture in different parts of Bangladesh. If we extensively follow Regenerative agriculture then soil health will be improved, water and air quality will be also improved, even more carbon will be stored to help mitigate the effects of climate change and enhancing ecosystem biodiversity. Regenerative agriculture increases the arable soil.

Consequently, it improves soil's physical properties by decreasing soil compaction, improving aggregate stability, and enhancing the chemical quality of soil by increasing its nitrogen and phosphorus content and increasing exchangeable potassium, sodium, magnesium, soil organic carbon and positively effects on soil microbial respiration as an indicator of soil biological activity. Incorporating the regenerative agriculture in Bangladesh can assist to tackle the vulnerability of climate change impcts and upcoming more food demands. For example, practicing agroforestry can produce year-round food production for humans and cattle. Diversification of agricultural practices helps to improve ecosystem services such as increase soil fertility and soil health, effective pest control, proper pollination, efficient nutrient management, water regime, and buffering of extreme temperature. An example of diversification is uses of legume plants in agricuture, which can effectively mitigate and adapt. Legume diversification reduces the use of nitrogen derived from fossil fuels and provides better ecosystem services by improved nutrient cycling, increasing soil biological activities and soil erosion control. Therefore, this intrigation can ensure yield and decrease the risk of crop failure. Agroforestry practices such as multipurpose trees improve soil fertility and microclimate to respond to different stress like drought, soil infertility, heat stress etc. Regenerative agriculture incorporate all the good and safe practices from past and new innovative farming methods to keep the good soil properties for the future generations. The Regenerative agriculture can be designed and decided according to socio-economic and environmental context.

The established practice of tillage systems, use of chemical fertilizers and pesticides, and market design of the current agriculture system cannot be changed drastically as it will affect production and cause confusion among the farmers and related stakeholders. By studying different geographic contexts and current agriculture practices, a slow transition needs to be planned and executed to incorporate regenerative agriculture through knowledge generation and capacity building of farmers, relevant institutions, and stakeholders. Hence, a gradual transition with the context-based and site-specific application of regenerative agriculture that can be used to ensure food security and reduce environmental impacts and climate change vulnerability must be implemented in Bangladesh agricultural sector. Ministry of Agriculture can take initiative to incorporate Regenerative agriculture in National agriculture policy. It should be also included in Delta Plan 2100 and Perspective Plan of Bangladesh

Constructed Wetlands: A Nature Based solutions for Waste Water Treatment

Fahim Muntasir Rabbi*
Md. Hasibur Rahaman*
K. M. Delowar Hossain*

Water is one of our planet's most valuable resources. No living being can't be sustained without water. But this life-sustaining element can be fatal when contaminated with harmful chemicals and toxic substances. Animals and plants that live in or near water can be affected by chemical compounds and pathogens in wastewater. It can also contaminate crops and drinking water that directly or indirectly affect human health through the food chain. On the other hand, this wastewater is also a useful resource, particularly in areas where droughts and water shortages are a common occurrence.

Therefore, Wastewater treatment is important to protect the health of human, animals, and their surrounding environment as well as to solve the problem of water scarcity by reusing the wastewater. There are several strategies for treating wastewater, and the better the procedure, the greater the chance of reuse. But industrial activity has extanded in the modern world. Because of that, large volumes of garbage are produced as a result of intensive manufacturing activity as well as new and emerging wastes are produced in production plants as new products being manufactured, which ultimately ended with wastewater.

The effectiveness of traditional methods of wastewater treatment has become limited over the last two decades and becomes increasingly challenged because of new emerging substances in wastewater. To meet these new challenges, a number of advanced and sophisticated wastewater treatment technologies have been tested, and implemented to remove a variety of potentially dangerous substances that are not adequately eliminated by conventional treatment processes.

Despite the fact that these novel treatment technologies have been shown to remove a wide spectrum of difficult chemicals from wastewater, they are still very expensive to establish and maintain. May if cannot be a fact for developed countries but a great challenge for developing countries where a sudden surge in industrial activities produces huge emerging waste but a little step has been taken to treat it.

Natural processes can clean water when it flowed through rivers, lagoons, streams, wetlands, and other water bodies. In the last few decades, strategies have been developed to exploit these natural processes in a controlled environment to improve water quality. Constructed wetlands (CWs) are well established, nature-based, and robust wastewater treatment technology, which has been applied worldwide. Organic matter, suspended solids, nutrients, metals, and even emergent contaminants can all be effectively removed by the physical, chemical, and biological processes occurring in Constructed wetlands.

*Department of Environmental Science and Technology, Jashore University of Science and Technology, Jashore-7408

These biological, environmentally friendly, and sustainable wastewater treatment processes can be alternatives to conventional treatments while offering a large-scale ecosystem service with enormous environmental and human benefits. Furthermore, Constructed wetlands are natural biodiversity hotspots that stimulate the growth of plants, microbes, and animals. In both developed and developing countries, CWs are becoming popular for wastewater treatment in small settlements and rural areas because of their unique advantages of low energy consumption and operating cost and require minimal operational attention.

Bangladesh is a developing country with one of the highest economic growth in South Asia as well as a great surge in industrial activities in the present decades. The clothe dyeing and leather industries are among those that are growing. All of those industries produce and release a huge amount of harmful chemicals as wastewater and a little amount of that wastewater is being treated before their final release to the river.

In this situation, the application of CW in the treatment of wastewater both domestic and industrial can be fruitful. CW can be operated at both small and large scales which gives it the potential for domestic and industrial-scale operation. Currently, Bangladesh has very small work on constructed wetlands and all of them are in lab-scale operation. So, research in this field should be extended as well as applied to the public scale.

Achieving Sustainable Development Goals in Harmony with Nature in Bangladesh

Dr. Gulshan Ara Latifa*

Bangladesh, a South Asian country with the highest population density (1,252 people per square kilometer) has been making its mark as one of the fastest-growing economies in the region and in the world, GDP growth for the last 10 years has been around 6 to 8% per year.

High population growth and undue share of natural calamities, as termed by Dr. Jeffry Sachs, a world-renowned economist, have added major challenges to eco-friendly economic growth. Low-income countries are highly vulnerable to the impacts of natural disasters and climate change due to their geographical location and resource constraints for developing climate action plans that will support their sustainable development goals.

Fortunately, the resilience of its people and proactive visionary leadership of the country have made it a model of sustainable development overcoming all the hurdles and challenges. Bangladesh is the second-largest exporter of ready-made garments, only second to China. Pharmaceuticals industry, heavy industries, such as ship buildings and chemical complexes, power generation industries, ITC industries and leather technology industries have joined the fray.

Agriculture production has tripled in tonnage and varieties in recent years. Bangladesh is one of the largest producers of rice (Bangladesh's milled rice production in 2018/19 was estimated at 34.91 million tons) after China, India, and Indonesia. The grain is the staple food for approximately 167 million people across the country and the rice sector contributes to half of the country's agricultural GDP and one-sixth of Bangladesh's national income. Bangladesh exports its rice to countries all around the world; in 2017, Sri Lanka purchased 50,000 tons. The regions of Aman, Boro and Aush are where the majority of Bangladesh's rice is grown. Bangladesh is one of the largest producers of freshwater fishes.

All these development activities either in the industrial sector or in the agricultural sector are having adverse effects on nature, the ecosystem, and biodiversity. The effluents of garment, chemical and leather industries are polluting the rivers and canals. For example the water of Buriganga, Sitalakkha have become black and in places, it turned into a tarry mess where no fish or other aquatic flora and fauna could survive. The government has shifted leather industries from the bank of Buriganga to Savar. The plastic pollution is a corollary of industrialization that has also seriously polluted rivers and canals, blocking the drainage systems, seriously affecting soil fertility and ecosystem. It was observed that microplastic has made inroad to our fish population which eventually gets into our food chain. Plastic bags are being dumped with waste in the cities and their disposal is a serious problem. The earth filing with the waste containing poly bags have been destroying the aeration of the soils and prevent soil fertility. Sonali Bag made from the jute product could the better option to poly bags if proper patronizations are given.

In the agriculture sector excessive use of fertilizers, and pesticides found their way to the water bodies and are causing an adverse effect on the aquatic flora and fauna. Aquatic populations are also affected by these chemicals.

Poultry industries have been thriving very well and meeting the needs of proteins of the people. But there too, unscientific, and unhealthy poultry feeds and indiscriminate use of antibiotics not only destroying the environment but are also helping the development of multidrug-resistant pathogens

*Professor & Academic advisor, Department of Environment Sciences, Stamford University Bangladesh.

which are becoming a serious human health problem. Similar practices in dairy farming are creating health problems. Serious and careful and scientific use of knowledge can provide us good quality protein without creating environmental pollution and health problems.

Bangladesh is one of the few countries in the developing world that has ensured the supply of electricity in every household which is contributing to the ease of life and rapid industrialization. But the use of coal and heavy oil for electricity generation is polluting our air, water and environment. It is noteworthy that the government has given the emphasis on renewable energy generation and also cleaner nuclear energy.

Shipbreaking industries are thriving well and meeting the need for steel. But care should be given to the ship breaking industries having recourse to a proper check-up of the contents of the ships so that this industry will not pollute the environment and also do not cause human health problems for the workers.

Bangladesh has taken up 100 export processing zones, each measuring thousands of hectares of land some of which are good agricultural lands of high productivity. It is undoubtedly a good initiative in terms of rapid economic development. But care should be taken to see the ultimate impact of these zones on the environment, and biodiversity-ecosystem of the areas adjoining those. Bangladesh previously agrarian economy did not have a good road and bridges system. As it is graduating to developing country from least developed country, there is a need for good transportation systems. So it has taken some mega projects for connecting the cities and to the sea ports and bridges over mighty river the Padma. Additional care should be taken to construct roads over flood flow zones so that it does not hamper the normal flow of the water. Recently government has taken a decision not to create road in the Hoar areas of few districts, Instead elevated way will be constructed where flood water flow will not be obstructed under the elevated way.

Ecosystem restoration comprises different components. Restoring and conserving biodiversity is one of the foremost steps toward ecosystem restoration. Ecosystem restoration and conservation is a comprehensive plan that seeks to maintain all species of plants and animals in a geographic area through the management of natural resources. Whereas many types of conservation may focus on one area, such as air or water quality, conservation of an entire ecosystem takes all of it into account. While it may present a difficult challenge, ecosystem conservation can also be one of the more productive forms of resource conservation.

The Post-2020 Global Biodiversity Strategy builds on the experience of the last couple of decades. There has been some significant successes in biodiversity policy and management. For instance, both in the EU and globally, the system of protected areas has expanded over the last few decades and covers over 17% of the land surface and 10% of the ocean.

The draft of the Post-2020 Global Biodiversity Strategy, currently under negotiation by governments, proposes a set of four goals for 2050 with associated milestones for 2030 and a set of

20 action targets. The goals are: to improve the condition of ecosystems, while supporting healthy populations of all species and reducing the proportion of threatened species; improve the capacity of nature to deliver benefits to people, the so-called ecosystem services; ensuring the fair and equitable use of genetic resources; commit sufficient resources to the implementation of the strategy.

Another barrier that hinders the process of restoring ecosystem is the changing climate. Climate is an important environmental influence on ecosystems. Changing climate affects ecosystems in a variety of ways. For instance, warming may force species to migrate to higher latitudes or higher elevations where temperatures are more conducive to their survival. Similarly, as sea level rises, saltwater intrusion into a freshwater system may force some key species to relocate or die, thus removing predators or prey that are critical in the existing food chain.

Climate change not only affects ecosystems and species directly, it also interacts with other human stressors such as development. Some impacts of climate change on ecosystem: Range Shifts; Food Web Disruptions; Buffer and Threshold Effects; Pathogens, Parasites, and Disease; Extinction Risks. Mitigating climate change is another focusing component towards ecosystem restoration. Mitigating climate change is about reducing the release of greenhouse gas emissions that are warming our planet. Mitigation strategies include retrofitting buildings to make them more energy efficient; adopting renewable energy sources like solar, wind and small hydro; helping cities develop more sustainable transport such as bus rapid transit, electric vehicles, and biofuels; and promoting more sustainable uses of land and forests. The 2018 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Special Report on 1.5 Degrees of Warming highlights the urgency of the needed climate actions: global emissions will need to peak by 2030 and rapidly decrease to net-zero by 2050 if we are to be able to stay within the safety limits established by the Paris Agreement.

In COP26, 2021, 151 countries had submitted new climate plans to slash their emissions by 2030. To keep the goal of limiting temperature, rise to 1.5°C within reach, it is needed to cut global emissions in half by the end of this decade. Although the conference was unsatisfactory in delivering the action and commitments needed to reach the targets from the Paris Agreement, COP26 has raised the global ambition on climate action. Successes at COP26: Green finance for the net zero economy; Disclosure and transparency for the private sector; increasing the pace of implementing the Paris Agreement. Shortcomings at COP26: Failure to meet 1.5°C target; not securing previously proposed climate finance.

Climate change is increasingly threatening lives and livelihoods and maximizing adaptation opportunities will minimize its potentially catastrophic effects. Ecosystem based (Approaches for Adaptation) (EbA) is a cost-effective, robust and flexible strategy that can cope with the magnitude, speed and uncertainty of climate change. EbA has already proven its worth in many situations and evidence is emerging of its success in helping people adapt to climate variability and change. Harnessing the adaptive forces of nature is economically viable and effective to combat the impacts of climate change. Its potential for synergies with other adaptation options, climate mitigation strategies and development goals warrant EbA having a prominent place in both the national and

international funding mechanisms now taking shape to fuel global adaptation efforts and in the adaptation decision-makers toolbox. With the impacts of climate change increasingly being felt across the world, it is important to scale up the approach to increase society resilience to climate change as well as to achieve more sustainable economic development. Indeed, though EbA still remains under-utilized by policymakers and associated stakeholders, it provides a viable strategy for pursuing development goals simultaneously with climate change adaptation and mitigation targets. With one life form producing oxygen while another breathing in it, ecosystems are interconnected and dependent on all living organisms, from the tiniest bacteria to the giant vertebrate. Some species provide food for others, some of which turn out to be prey to larger species, all contributing to the precious balance of the ecosystems. The ecosystem is actually a complex of all living

Organisms where they share an environment and interrelationships within a distinct unit of space. It consists of both abiotic and biotic constituents in which the former include air, soil, minerals, water, sunlight, and the climate, and the latter include the rest, the living organisms. As ecosystems support all forms of life, the earth along with its inhabitants could have been happier if the habitats were healthier.

In a nutshell, climate change mitigation cannot be succeeded without biodiversity restoration, and biodiversity restoration is a must needed approach for restoring the ecosystem. All these activities could be done successfully only if all the countries come forward together to work on and hence impacts of climate changes could be mitigated globally for the sake of all the creatures of this mother earth. At the same time the biodiversity could be restored as well and we can restore the ecosystem successfully.

World Environment Day gets recognition as the biggest and most significant global celebration that encourages people to protect our natural environment from several challenges our world faces today. The World Environment Day, also known as People's Day, allows people an opportunity to undertake environmental actions and join an important platform where they can promote Sustainable Development Goals (SDGs), particularly the ones linked with the environment.

Progress Activity of Bangladesh with UNCCD COP 15

Dr. Md. Yousuf Ali

Background

The Conference of the Parties (COP) of UNCCD are the supreme decision-making body of the convention. Its discussions are assisted by the recommendation of its subsidiary bodies, expert groups and communications from the Parties to the Convention. The first five sessions of the COP were held annually from 1997 to 2001. Since 2001, the COP sessions are held on a biennial basis. The COPs since the convention became effective in December 1996. This year COP 15 was held from 09 to 20 May 2022 Abidjan, Ivorie Coast.

The Convention

The text of the Convention was negotiated by the International Negotiating Committee for Desertification (INCD) for the elaboration of an International Convention to Combat Desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa during the preparatory process of the 1992 RIO Conference. The final text of this Convention as the United Nations Convention to Combat Desertification, particularly in Africa (UNCCD) was forwarded to the Office of Legal Affairs of the United Nations, which acts as Depositary, in order to prepare for the signing ceremony that was held in Paris, on 14-15 October 1994, following completion of the verification processes as requested by the INCD upon adoption of the Convention at its fifth session, on 17 June 1994. The Convention went into force in 1996. The convention has been divided into five parts. The Convention with its five Regional Implementation Annexes is providing the legal framework for combating desertification and land degradation (DLDD).

The basic terms used in the convention are to be understood as following:

- "Drought" a complex and slowly encroaching natural hazard with significant and pervasive socio-economic and environmental impacts, is known to cause more deaths and displace more people than any other natural disaster.
- "Desertification" means land degradation in arid, semi-arid and dry sub-humid areas resulting from various factors, including climatic variations and human activities;
- "Combating desertification" includes activities which are part of the integrated development of land in arid, semi-arid and dry sub-humid areas for sustainable development which are aimed at(i) prevention and/or reduction of land degradation;(ii) rehabilitation of partly degraded land; and (iii) reclamation of desertified land;
- "Land Degradation" means reduction or loss, in arid, semi-arid and dry sub-humid areas, of the biological or economic productivity and complexity of rainfed cropland, irrigated cropland, or range, pasture, forest and woodlands resulting from land uses or from a process or combination of processes, including processes arising from human activities and habitation patterns, such as:(i) soil erosion caused by wind and/or water;(ii) deterioration of the physical, chemical and biological or economic properties of soil; and(iii) long-term loss of natural vegetation;
- "Land Degradation Neutrality (LDN)" LDN is defined as a “state whereby the amount and quality of land resources necessary to support ecosystem functions and services and enhance food security remain stable or increase within specified temporal and spatial scales and ecosystems” (UNCCD, 2015).

*Deputy Director, Department of Environment, MOEFC, Bangladesh

- "Arid, semi-arid and dry sub-humid areas" means areas, other than polar and sub-polar regions, in which the ratio of annual precipitation to potential evapotranspiration falls within the range from 0.05 to 0.65;
- "Affected areas" means arid, semi-arid and/or dry sub-humid areas affected or threatened by desertification;
- "Affected countries" means countries whose lands include, in whole or in part, affected areas.

Managing different natural resources, Land degradation status and Measures for in Bangladesh:

Background

Land degradation in Bangladesh is reflected in soil nutrient and organic matter depletion, soil erosion, soil-water, soil pollution, deforestation, loss of vegetation cover, falling ground water levels, drainage congestion/water logging, river bank erosion in major rivers as well as the tributaries and distributaries, and unsanitary practices for disposal of solid and other wastes. The impact of climate change and sea-level rise is apparent everywhere in Bangladesh as a threat to land resources and the economy. In drier parts of Bangladesh, soil fertility decline has been identified as the principal manifestation of land degradation. While in the coastal areas - cyclones, surges, and saline intrusion are playing havoc. The Barind Tract, which is the driest part of the country in the north-west, is characterized by hard red soil with low moisture content. Farming is heavily dependent upon rainfall, and large areas remain uncultivated in those years when rainfall is scarce and unpredictable. In recent years there has been a tremendous expansion of irrigation through pumping water from river and deep aquifers. Land degradation in the coastal areas is characterized by water logging which has caused a decline in productivity. Salinization caused by the expansion of shrimp farming and sea level rise is also affecting a large tract of land. The coastal areas are also severely affected by the destruction/disappearance of mangroves.

Impacts of Land Degradation

The impact of land degradation by and large land productivity losses, biodiversity losses and loss of soil resilience of soil to adapt climate change directly Sundarban, the largest single patch of mangrove forest in Bangladesh is under constant threat due to an increase in the salinity and silt deposition as a result of increased soil erosion from upstream river basins. The wetlands, such as the Ramsagar in Dinajpur and the Haors (land depressions having water year round) are sanctuaries for migratory birds, and these are under threat due to agricultural expansion and hazards of climate change.

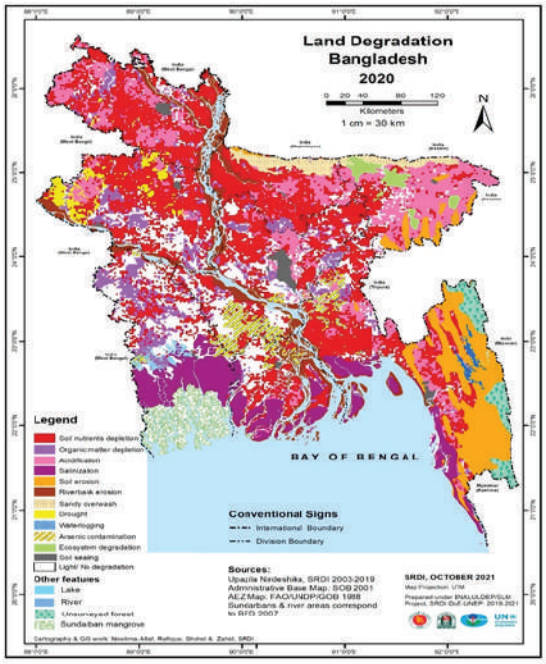

Land Degradation map-1 Source: CGIES

In 2020, moderate to very severe classes of degraded land is approximately 11.24 m.ha. It is about 76.1% of the country. This degraded land is 0.54 m.ha higher than previous estimation [10.70 m.ha & 72.5% of the country area estimated in 2000]. This map shows, during 2000-2020, each year around 27,000 ha of land has been newly added to already degrade land.

Land use changes from 2010 to 2020

Land use change and land degradation is a serious problem for sustainable development and food security in Bangladesh. Land use map 2020 and 2010 was compared to understand the Land use changes. Analysis of Land use changes from 2010 to 2020 shows that forest land, cropland and water body area shows decreasing trend whereas grassland, rivers and khals, settlements, aquaculture, orchard and other land areas show increasing trend. About 11,139 hectares forest land area has been decreased from 2010 to 2020 whereas aquaculture area has been increased to 3,58,396 hectares in 2020 from 2, 92,949 hectares in 2010. Also, 79,143 hectares of Orchard and other plantation was increased during 2010 to 2020. According to the land use change, highest conversion of land use class was experienced in Cropland class from 2010 to 2020. The land use change matrix will help to identify the possible causes of transition of land use classes from one to other.

Map-2. Land Use Map, 2010 of Bangladesh

Map -3. Land Use Map, 2020 of Bangladesh

Erosion and Accretion of Major Rivers

River erosion is one of the major hazards of Bangladesh. The rate of erosion in recent year is rather high damaging infrastructures and settlements in several areas. In the last few decades it can be seen that the Jamuna is widening and both of its banks are migrating outwards at a high rate. The rate of erosion has varied over time reflecting the response of the widening process. Along the right bank of the Jamuna River was 407 ha was eroded in 2021, of which about 39 ha comprised settlements. About 94 m of rural road were also eroded in the right bank. Erosion along the left bank of the Jamuna River was much higher than that of the right bank due to the presence of highly erodible bank materials on the left bank. About 1070 ha of land, of which 133 ha were settlementswere eroded last year.

The Land Degradation Neutrality- National Targets for Bangladesh

Bangladesh set its voluntary national LDN targets that have been validated by the LDN working group and submitted by the National Focal Point of UNCCD through the status update note on LDN. Based on the national commitment to achieve LDN by 2030, the following preliminary LDN 6 targets have been defined for Bangladesh: namely Target 1: To improve soil fertility and Carbon status in 2000 km2 of cropland area. Target 2: To reduce land use/ cover conversion in 600 km2 of forest area. Target 3: To reduce waterlogging in 600 km2 area. Target 4: To reduce soil erosion in hilly areas in 600 km2 area. Target 5: To protect non-saline land areas from salinity intrusion in 1200 km2 in coastal zone area. Target 6: To reduce riverbank erosion @100ha/year covering 100 km2 areas.

Land Degradation Neutrality (LDN) status

Assessment of LDN trends, coupled with an analysis of the driving forces behind these trends, are essential steps to understand current conditions of land degradation and also figure out anomalies in identifying degraded areas. Accounting temporal and spatial negative changes (2000 and 2010) in (a) Land use/Cover Change (LCC), (b) Land Productivity Dynamics (LPD) and (c) Soil Organic Carbon (SOC) status are assessed for trend analysis to understand land degradation context.

Measure to Achieve LDN:

a) Sustainable management of land (SLM)

Rapid increase of population and diversity of usage of land resources transform the scenario more perilous. Maintaining ecosystem functions and services, while also supporting human wellbeing, are the primary goals of sustainable land management (SLM). SLM has great potential and adaptability to local contexts, and can preserve and enhance ecosystem services in all land-use systems. To address these issues in achieving Land Degradation Neutrality (LDN) and Sustainable Development Goals (SDG) 15.3 field experiences in Bangladesh and from other countries are important. SLM best practices that protects and enhances the multiple services and functions such four distinct categories: namely 1. Provisioning services: provision of food, fodder, fibre, fuel and freshwater. 2. Regulating services: regulation of climate, water quality and quantity, pollination, and diseases control. 3. Supporting services: support nutrient and water cycling, support Soil and vegetation cover – for water, carbon and biodiversity. 4. Cultural services: Benefits for culture and society.

b) Ecosystem-Based Approaches to Adaptation (EbA) in the Drought-Prone Barind Tract and Haor Wetland Area Project

The Barind Tract is a semi-arid region in the northwest of Bangladesh. Rapid population growth along with poorly planned development activities and unsustainable agricultural practices has resulted in increased pressure on the ecosystems, fresh water and agricultural land in the Barind area. The Haor wetland area is located in the greater Sylhet District and includes Bangladesh's most important freshwater wetland ecosystems. This area comprises a number of depressed basins - known as 'Haor' – that are inundated by fresh water during the monsoon season and gradually dry out during the dry winter season. These unsustainable management practices are resulting in irreversible consequences, such as changes in geomorphology, loss of habitat and hydrological functioning.

c) Forest and Biodiversity

Bangladesh Forest Inventory (2015-2019) report shows that, the forest cover in Bangladesh is 12.8% of the country which is 14.1% of the country's land area. Growing stock (commercial wood volume) is 384 million cu. m., carbon stock is 1276 million tons, tree basal area is 4.52 sq. m. per hectare and seedling density is 1419 per hectare for the country. Forest area contains 22% of country's carbon stock and 66% of growing stock is coming from trees outside forests (ToF). Denuded Forest Plantation program is gaining movement across the country in Bangladesh. Many denuded sites have been planted under different plantation Projects. The amount of plantation raised in the denuded forest in the last five year 2016-2021 amount of 42503 (ha) by Bangladesh forest department.

d) Social Forestry, Agroforestry, Forest management and policy

The ever-increasing population of Bangladesh is imparting pressure on existing government managed forest resources resulted to it's over exploitation. A number of programs have been implemented to reduce the depletion of natural forest. Between 1981-82 and 2020-21, a total of 102.3 thousand hectares block/woodlot/ agroforestry plantation and 76,652 km strip plantation were raised. Till to date, about 726,654 nos. poor people is involved in Social Forestry Program. Considering the importance of biodiversity and natural resources conservation, the government of Bangladesh has accepted and legalized the co-management in Protected Areas (PA). The National Forest Policy, 1994 underscored the need for bringing 20% of the country's landmass under forest cover by 2015, by establishing plantations in available forest land, private homestead land and public institutions, roadside, railway track side, embankment slopes as well as in the unclassed state forest in the three hill districts, taking support from local communities and NGOs to ensure people's participation.

Conclusion and recommendation or suggestion

- Achieve the LDN issues are looked upon from degradation perspective for productivity, some of land losses or degradation that we face in Bangladesh such as riverbank erosion, sand wash, un-sustainable land use practices in hilly areas resulting in landslides, and other land losses that cannot be reversed.
- Three land-based progress indicators as set out in decision 9/COP.12 for reporting under the Rio conventions and the Sustainable Development Goals, which are coherent with the progress indicators/metrics adopted in decision 22/COP.11 namely (i) trends in land cover; (ii) trends in land productivity or functioning of the land; and (iii) trends in carbon stock above and below ground;
- Sustainable Land Management (SLM) best practices adopted at local levels in different agro-ecological situations are the best options and fundamental for the sustainability of the national economy as well as benefiting from the many ecosystem services.
- This writeup implies a need for more policy experimentation and evaluation to better understand how land restoration can be achieved at scale, at the lowest possible cost to societies. This makes it possible to estimate the potential of land restoration measures to prevent losses in land condition and ecosystem functions that would otherwise take place there are three main factors that affect land condition and ecosystem functions: such as Land-use change (due to the increasing global demand for food, feed, fibre and bioenergy crops), Climate change effects and the impact of current land management practices.

Chemical Management: A significant way to superintend

Nazim Hossain Sheikh*

Bangladesh is a developing country. The country boosts her economy mostly depends on ready-made garments and textile. A greater portion of chemicals is used in the aforesaid sector. Besides this chemicals are used in the leather industries, effluent treatment plant, testing laboratories, fertilizer manufacturing, plastic industries, zipper & button manufacturing, electric cable manufacturing, herbicides & pest controls and so on. Most of the chemicals bear hazard and could badly affect human health and nature. In order to protect workers from the hazards of chemicals, to prevent or reduce the occurrence of chemicals prompted illnesses and injuries from the use of chemicals at work in the various sector as well as to enhance the protection of the over-all public and the environment of Bangladesh a proper chemical management is necessary. A Chemical Management System is a process that ensures proper compliance with safety, environmental and food safety policy, Improves quality of life and the environment. Sound management of chemicals focuses on prevention. It minimizes the risks for the environment from production, use and disposal of chemicals. For instance, it supports the substitution of harmful chemicals and the reduction of toxic chemical releases.

Good Management Practice by the Importers:

The importers/users shall maintain practices-

- Ensuring that all chemical for use at work including impurities, by-products and intermediaries as well as wastes are evaluated to determine their hazards
- Ensuring that factories are provided with a mechanism for obtaining from their chemical suppliers adequate information about the chemicals used at work to enable them to implement effective chemical management measure to protect workers, environment and the general public from chemical hazards
- Providing all personnel at all levels in the factory with information about the chemicals and about appropriate safe practices in the factory´s chemical management system.
- Establishing principles for such factory´s chemical management system and programmes to ensure that chemicals are used in a safe and environmentally sound way
- Complying with national chemical requirements.
- Importer/ Users shall maintain a Chemical Inventory List (CIL) including chemicals in production, spot cleaners, and wastewater treatment plant, lubricants and grease, in the factory/go-down or kept in the factory/go-down.
- The factory shall develop and use a storage management system (e.g. first-in-first-out FIFO) to reduce the probability of surplus stocks and expired chemical stocks.
- Factory shall maintain a vigorous procedure for establishing and updating the CIL with dedicated person being specifically responsible for maintaining the CIL.

*Deputy Director, Department of Environment

The CIL shall contain the following information:

a) Chemical name and type
b) Chemical Abstracts Services (CAS) or similar unique identification number for a single chemical or several numbers for the different components when a mixture
c) Formulator and supplier/vendor name and type as well as contact details
d) Use/function of the chemical product
e) Quantity delivered or in stock
f) Consumption
g) Required storage conditions and storage location
h) Availability and location of safety data sheet (SDS) as well as technical data sheet, if latter being made available by chemical supplier
i) Lot numbers
j) Date of purchase

Chemical labelling and marking:

1. Every single chemical container in the factory shall clearly identified with printed labels on the containers.

Chemical containers that have not labelled shall not be used until the relevant information is obtained from the supplier or other reliable sources.

2. Labels on the containers shall follow the standard of the Globally Harmonized System of Chemical Classification and Labelling (GHS) or a similar uniform and recognized system.
3. Besides the GHS label requirements, the following information should also be present on the container label: (i) The lot number or batch number (ii) Date of manufacture and expiry date.
4. Proper labelling shall also be applied to the chemical waste containers.
5. If full labelling is not practicable, the labelling on waste container shall include contact number of a relevant personnel who can provide information about the composition and potential risks of the waste.
6. Factory shall provide adequate training to all the workers handling chemical products on chemical labelling, GHS pictograms and hazard and precautionary statements.

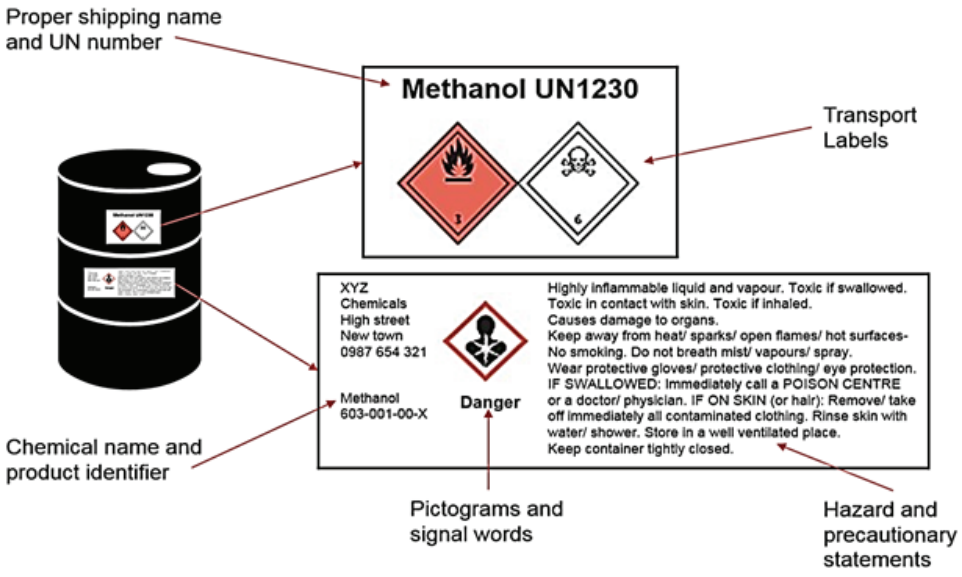

Figure: Pictograms and precautionary statements

Using safety data sheets:
Safety Data Sheet (SDS) is a widely recognized fundamental source of information on chemicals. Factory shall obtain a SDS for every chemical product used. SDS shall be kept at a central location as well as at main store and sub-store and SDS shall be made available in the official national or local language understood by the workers. It is a document that provides information on:

a) Hazards of a chemical substance or preparation
b) Potential health effects
c) Safe handling and storage of chemicals

Assessing, classifying and mapping chemical hazards and risks:
A hazard is an intrinsic property of a chemical substance to cause harm to humans and/or the environment. Risk is the probability of a chemical substance to cause harm or an adverse impact. Hazard and risk are linked by exposure. The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) distinguishes between three main groups of hazards: (1) physical, (2) health and (3) environmental hazards. Hazards shall be clearly stated in the labelling:
Risk assessment:
The following steps should be followed to perform a risk assessment:

a) Description of the situation/process/task
b) Determination of the number of persons involved
c) Identification and categorization of severity
d) Estimation of probability/ likelihood – similar to the severity categories, criteria for the probability/likelihood will have to be defined as part of the factory´s risk assessment procedure
e) Establishment of a risk scoring system.
f) Taking of decision whether further action is required, and assignment of priorities
g) Repetition of steps for each activity in the manufacturing processes involving use of chemicals and mark the risk factor on your flow chart.

Using measures for controlling chemical hazardous to health:
The employer should make sure that all workers are protected against the risk of injury from chemicals hazardous to health. Worker should not be exposed to chemicals hazardous to health, in particular to an extent which exceeds exposure limits or other exposure criteria for the evaluation and control of the working environment established by the national authority.
Use of good design and installation practices:
The basic principle of the installation practices and engineering controls is to isolate people from the hazardous chemicals or reduce exposure to them. For this purpose, the factory should consider the following control measures:

a. Using totally enclosed process and handling systems
b. Segregating hazardous process from the operators or from other processes
c. Using plant process or work systems which minimize generation of, or suppress or contain hazardous dust, fumes, vapors and which limit the area of contamination in the event of spills leaks or accidental releases
d. Installing and using particular enclosure, with local exhaust ventilation (LEV) connected to ducting systems which guide the exhaust air away from the work area and/or to a collection or treatment device
e. Providing sufficient general ventilation (engineered and natural) to ensure proper air change ratios.

Use of safe work systems and practices

In support of the aforementioned engineering controls, factory shall implement administrative control measures to reduce the number of workers exposed and manage their way of working with chemicals. These measures shall be related to changes in work procedures such as written safety policies, rules, supervision, schedules, and training with the goal of reducing the duration, frequency, and severity of exposure to hazardous chemicals or situations. Administrative controls should include;

a) Reducing the number of workers exposed and limiting access to non-essential areas or areas with hazardous substances present.
b) Reducing the period of exposure of workers by rotating workers between tasks and/or specifying extended periods of breaks over a workday.
c) Reassigning female pregnant workers to tasks or work areas not involving handling of hazardous chemicals
d) Ensuring regular cleaning of contaminated walls, surfaces etc.
e) Conducting regular training and providing instructions to workers on hazards and safe handling of chemical products, understanding and reading labels & hazard symbols, spill management procedures, and/or PPE use and create awareness about hazard of chemicals.

Use of personal protective and hygiene measures

The employer shall provide suitable and sufficient supply of personal protection equipment (PPE) in line with the GHS aligned standard SDS. PPE shall be selected based on hazard/risk assessment that identifies the specific chemical or physical hazards associated with the specific work tasks. Employer should provide training to the new workers about PPE before joining at the workplace and how to dispose PPE after use.

Control measures for flammable, dangerously reactive or explosive chemicals:

The prevention of fire is the fundamental principle of fire management and the factory shall perform the following steps to prevent fire incidents:

- Proper ventilation of areas with flammable substance to reduce dangerous concentrations
- Removal of possible ignition sources like sparks, flames, burning tobacco or hot surfaces.
- Assignment of hazard zones with flammable chemicals using labels with warning signs.
- Substitution or elimination of flammable chemicals
- Flammable substances shall be kept in suitable containers
- Segregation of incompatible chemicals according to the compatibility chart with walls, floors, shelves, and fittings made of suitable materials
- Storage of containers with flammable chemicals away from doors Keeping the flammable chemical storage area dry, cool, out of direct sunlight, and away from steam pipes, boilers or other heat sources.
- Keep the amount of flammable chemicals in storage in a small scale.
- Flammable chemicals shall be removed from the storage area during maintenance work (e.g. welding).
- Factory shall ensure the handling of flammable chemicals in a dry and chemically inert atmosphere where adequate ventilation is provided.
- Factory shall identify the areas where hazardous explosive atmospheres may occur and classify into zones.

Good chemical storage practices

Chemicals are often stored in several locations in the industry including main stores, sub-stores close to production and in bulk storage areas for commodity chemicals. The storage area should be designed in accordance with established criteria

such as Bangladesh National Building Code (BNBC) 2020. Hazardous chemicals should be stored under conditions specific to their inherent properties and characteristics to ensure safety. Chemicals with usual properties and characteristics that are relevant include:

a. flammable liquids;
b. flammable gases;
c. toxic chemicals;
d. corrosive chemicals;
e. chemicals that emit highly toxic fumes in the event of a fire;
f. chemicals which, in contact with water, give off flammable gas;
g. oxidising chemicals;
h. explosives;
i. unstable chemicals;
j. flammable solids;
k. compressed gases.

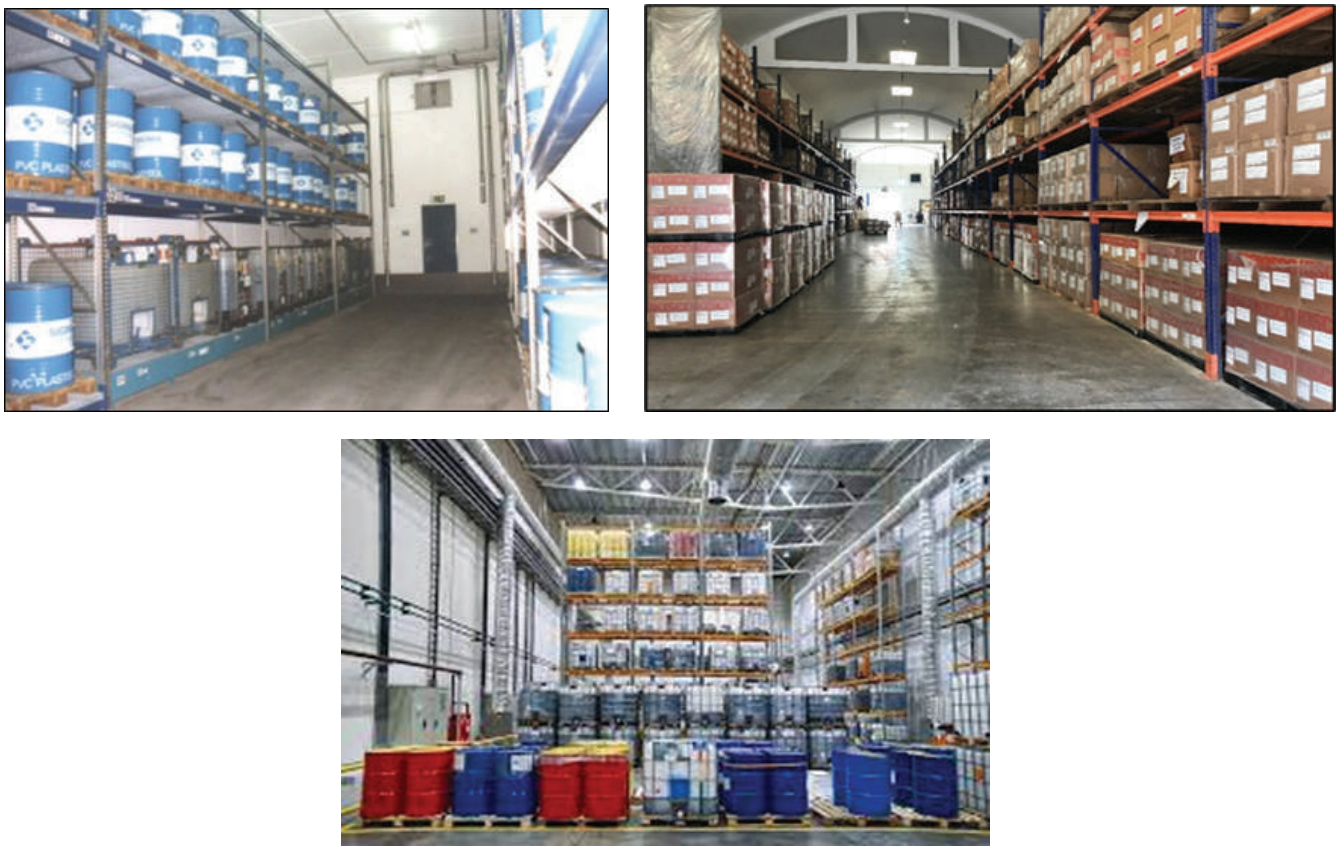

Figure 7: Common good storage management practices (Example)

Good practices in onsite and offsite transport of chemicals:

Chemicals may be transferred to or from work areas through pipelines or conveyors or by using

forklift trucks, trolleys or wheelbarrows. Before transport, the SDS of the chemical should be checked to understand the properties, safety concerns and precautions such as PPE safeguards. The following practices are useful;

- The quantity, nature, integrity and protection of the packaging and containers used in transport, including pipelines should be checked beforehand.
- Chemicals transported by forklift truck should have warning labels, maximum load capacity information and maximum speed limit displayed.
- Chemical transporting vehicles (e.g. forklift truck) should travel on clearly marked passageways of adequate width, to reduce the possibility of collision and spillage.
- Excessive shaking of liquid chemicals should be avoided to prevent leaking due to over volatilization.
- Certain chemicals may be conveyed through pipe systems inside the factory. A standard colour coding system

should be established to clearly identify what the respective pipe may contain.

- Special training and instructions should be provided to drivers/operators of transport vehicles,
- During loading and unloading operation the vehicle engine shall be stopped.
- Chemical waste should be transported in a properly sealed container with clear labeling of the compound and relevant safety warnings.

Dealing with fire and explosions:

- Fire alarm systems (both sound and light) should be available in the factory and these must be distinct from other alarms and notification systems.
- Suitable and adequate fire-fighting equipment should be available on-site transport and storage.
- Automatic sprinkler system should be available at the place where flammable chemicals are stored.
- There should be emergency lights and emergency exit signs as well as “No Smoking” signs within the factory.
- Sand buckets, hydrants and fire hoses should be available at chemical stores and other high-risk areas in the factory.
- Adequate drainage from the workplace should be provided.
- Fire-proof electrical wiring cables should be used to avoid short-circuit and explosion-proof lighting should be installed in chemical stores
- Regular fire drills and training of staff on use of fire equipment and evacuation methodology should be given to workers about the hazards of fires involving chemicals and the appropriate precautions to be taken.

Dealing with chemical spills and leaks:

In case of any spillage of chemicals, following facilities should be presented to contain the spillage:

a) A secondary containment for chemical containers to arrest the spread of spillage
b) A standard spill control kits containing sawdust, sand or any other absorbent container to absorb the liquid spill, broom, shovel and gloves, an empty container marked “Hazardous Waste” and a trolley to keep these items (for taking them quickly to the spillage place).
c) Safety Data Sheet (SDS) and manufacturer’s instructions describing the corrective action
d) Personal protective equipment to be used during clean-up.

The factory shall refer to the following guidelines to determine the location and arrangement of eye wash and body shower stations:

a) Eye wash units and body showers both should be located within 10 seconds of unobstructed travel distance from any work areas where corrosive material hazard are prevalent or, as recommended by a physician or appropriate official.
b) These should be placed in a well-lit area and identified with signage.
c) These should be located on the same floor level as the hazard area

Managing chemical containing wastewater and treatment sludge:

Each factory must, at a minimum:

a) Be compliant with applicable wastewater and sludge discharge permits according to national standard.
b) Ensure there are no unpermitted bypasses for untreated wastewater around wastewater treatment systems.
c) Not dilute wastewater discharge with incoming water or cleaner wastewater as a means to achieve conformance to concentration-based discharge permits.
d) Properly classify sludge produced from a wastewater treatment plant
e) Ensures treatment sludge is properly treated and disposed of.

1. The factory shall ensure the treatment of wastewater thereby maintaining the conventional parameter limits including temperature, pH, biological oxygen demand (BOD), or chemical oxygen demand (COD), Dissolved Oxygen (DO), Total Dissolve Solids (TDS) and others according to ECA 95 and ECR 97.

Figure: Good practice in waste storage

Using a quality assurance programme and monitoring performance of chemical:

The role of quality assurance (QA) in the chemical plant shall be clearly defined in management documents, as well as who is responsible for each area and activity. The documentation shall also specify which records of routine operations, such as equipment calibration and maintenance, shall be collected, ensuring that a logical and consistent record-keeping system is implemented. All staffs shall be adequately trained for the task they have to perform. Standard Operating Procedures (SOPs) shall be prepared by the factory which will describe sampling, transportation, analysis, use of equipment, quality control, calibration, production of reports, etc. It shall also include the calibration, maintenance, and quality control methods and frequency, as well as the corrective action to be performed in the event of a malfunction or loss of control.

Chemical security related to Explosive chemical purchase and misuse:

The factory shall take steps to prevent misuse of the chemicals used or present through preventive and precautionary measures. Apart from physical arrangements, the employer shall publish specific in-house rules regarding chemical security. These rules also should specify the consequences of any related misconduct. The underneath matters should strictly follow;

- Unauthorized removal of hazardous substances such as chemical substances of explosives nature or strong acids by factory´s own personnel or any external persons shall be prevented by controlling access to the areas where these substances are stored or kept.
- Chemical security consideration shall be taken into consideration when arranging chemical storage set-up as well as formulating chemical storage and handling rules.
- Regular stock taking by comparing records of chemical quantities dispatched and consumed and stocks in hand shall be applied on a quarterly basis for such hazardous chemicals. In case of discrepancies, the employer shall initiative investigation.
- The employer shall clearly communicate in-house rules regarding chemical security as part of the personnel induction and refresher training.

Since chemicals are very much useful for our economic development, we have to manage it in a proper way with ensure security. Good chemical management for a better storage, better workplace, good human health and environment and robust nation.

Quest for Sustainable development in the Energy Sector through the Provision of Eco-development

Md. Hafiz Iqbal, PHD*

Introduction

It is predicted that from 2011 to 2030, global energy consumption will rise by 36% at a 1.6% growth rate, where fossil fuel-based hard energy has a greater contribution (88%) to total energy supply [1]. More utilization of hard energy accumulates major greenhouse gases (carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O) concentration to nature [2]. Global CO2 emission was 19,074.50 million tons throughout the world in 1981, and it has continued to increase 34,032.70 million tons in 2017 [3]. This trend will rise by 85% within 2040 [4]. Bangladesh is not free from such circumstances as it largely depends on hard energy (furnace oil: 20.44%, diesel: 7.80%, power import: 4.07%, coal: 2.04%, hydro: 1.88, natural gas: 62.20% and other: 1.60) for power generation and transmission [5].

In Bangladesh, power generation is mostly dominated by indigenous natural gas (62.20%), which is now showing a depleting trajectory because of its faster rate of utilization by 300% from 1990 to 2019 [6]. Bangladesh has been experiencing a severe energy crisis for about three decades and is third among the top twenty countries where people lack electricity [7]. The energy crisis is terrible in rural Bangladesh. Only around 30% of rural households have interrupted access to grid-connected electricity [8], while about more than 75% of the total population (equivalent to 164.20 million in 2012) in the country live in the village. Almost 58% of rural families in the country are basically “energy poor” (i.e., utilization of modern energy services per capita is very low), with a shortage of access to reliable and basic hard energy facilities [9]. In recent years, quick rental power plants have been established to minimize the immediate power shortage, responsible for raising the price of electricity in the country [10]. Like the shortage of access to grid-connected electricity, rural households have almost no natural gas access through pipelines for cooking. The dumped household organic waste creates emission from methane and enhances the greenhouse gases (GHGs) in rural Bangladesh. Emissions of GHGs lead to unprecedented transformations in the earth’s climate, and long-term environmental changes [11].

Environmentally friendly eco-development (desirable and soft change for a human social group, which is held to be not only better, but in economic and ecological equilibrium) practices, policies, and programs are highly required to overcome this situation. Economically equitable, socially ennobling, and environmentally balanced issues for sustainable rural development, low carbon growth, proper use of soft energy, and long-term adjustment of climate change are the main features of eco-development. Thus, Eco-development is the best platform for climate change mitigation. Organic waste and solar will be a potential source of electricity generation and develop an eco-development mechanism. The provision of soft energy in eco-development has no insoluble problems, but hard energy options involving reliance upon fossil fuels and uranium can, on the one hand, lead to short term benefits while, on the other, they store up great difficulties in energy supply for the future [12]. Eco-development provides external benefits and is essential to assess green growth practices to justify climate change mitigation actions in the energy sector [13].

*Assistant Professor (Economics), Government Edward College, Pabna

Concept of Eco-development

Traditional development models delude low-income countries on two major counts. Firstly, low-income countries hold out material improvements attained through economic growth lead to develop expropriation of existing natural resources and overexploitation of labor; secondly, most of the poor countries are mollified by antidotal aid aim to combat disease, disaster, malnutrition, food insecurity, and illiteracy. These traditional models always ignore flows of non-existent natural resources that have more significant potential for overall well-being.

The improved society belonging to Northern nations is generally known as a consumer society. This society motivates low-income countries towards growth and creates inequality within and between nations [11]. A number of poor nations are now exploiting for their growth and generating the selfsame dividend society suitable for generating soft-energy in terms of its origin, features, applicability, and future.

Every society can convert renewable resources into soft-energy such as solar power, tidal and wind offshoots, hydro and vegetable, alcohol, or biomass. On the contrary, hard energy options like fossil fuels, uranium, gas, and coal from the non-renewable can, on the one hand, lead to short-term benefits while, on the other, they accumulate great difficulties in energy supply for the future.

Conclusions

The objective of soft energy is to ensure a low carbon society and efficient utilization of energy. The economic case for soft energy includes the cost of energy, eco-development, green growth, and building well-being and resilience. However, in rural Bangladesh, the effectiveness of soft energy remains far from satisfactory due to the lack of awareness or social mobilization.

Bangladesh is one of the most electricity deprived nations (47). Despite the large potential for soft energy sources in Bangladesh, their contribution to the power generation remains insignificant. The existing so-called service from soft energy does not meet the demand for energy and goal seven of SDG because of its shorter coverage facilities, inappropriate policy framework, and institutional support. Adequate use of soft-energy is considered an indispensable component of a sustainable energy system. The interest of rural households towards soft energy can be increased if soft energy payment is cost-effective based on our proposed socio-economic-demographic factors. Hence, any policy aiming to undertake soft energy service is needed to consider these factors for effective management and implementation of soft energy and eco-development.

References

[1] Islam M.T., Shahir S.A., Uddin T.M.I., and Saifullah A.Z.A., 2014. Current energy scenario and future prospect of renewable energy. Renewable and Sustainable Energy Review 39: 1074-1088.

[2] Shindell D. and C.J. Smith, 2019. Climate and airquality benefits of a realistic phase-out of fossil fuels. Nature 573(7774): 408-411.

[3] Bushra N. and T. Hartmann, 2019. A review of state-of-the-art reflective two-stage solar concentrators: Technology categorization and research trends. Renewable and Sustainable Energy Reviews 114: 109307.

[4] Meyer I., Leimbach M., and Jaeger C., 2007. International passenger transport and climate change: A sector analysis in car demand and associated CO2 emissions from 2000 to 2050. Energy Policy 35: 6332–45.

[5] Sohag M.A.Z., Kumari P., Agrawal R., Gupta S., and Jamwal A., 2020. Renewable energy in Bangladesh: Current status and future potentials. In Proceedings of International Conference in Mechanical and Energy Technology, 353-363. Springer, Singapore.

[6] Das A., Halder A., Mazumder R., Saini V.K., Parikh J., and Parikh K.S., 2018. Bangladesh power supply scenarios on renewable and electricity import. Energy 155: 651-667.

[7] Khan M.E. and A.R. Martin, 2016. Review of biogas digester technology in rural Bangladesh. Renewable and Sustainable Energy Reviews 62: 247-259.

[8] Goel S. and R. Sharma, 2017. Performance evaluation of standalone, grid connected and hybrid renewable energy systems for rural application: A comparative review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 78: 1378-1389.

[9] Barnes D.F., Khandker S.R., and Samad H.A., 2011. Energy poverty in rural Bangladesh. Energy Policy 39: 894–904.

[10] Islam S. and M.Z.R. Khan, 2017. A review of energy sector of Bangladesh. Energy Procedia 110: 611-618.

[11] Iqbal M.H., 2017. Economic benefits of an ecotown for slums in Dhaka city of Bangladesh: An application of discrete choice model. Australian Academy of Business and Economics Review (AABER) 3(2): 61-75.

[12] Riddell R., 1981. Ecodevelopment. Hampshire: Biddles Limited.

[13] Streimikiene D., Balezentis T., AlisauskaiteSeskiene I., Stankuniene G., and Simanaviciene, Z., 2019. A review of willingness to pay studies for climate change mitigation in the energy sector. Energies 12(8): 1481.

[14] Engle P.L., Fernald L.C., Alderman H., Behrman J., O'Gara C., Yousafzai A., and Iltus S., 2011. Strategies for reducing inequalities and improving developmental outcomes for young children in low-income and middle-income countries. The Lancet 378(9799): 1339-1353.

Urban Agriculture for Sustainable Urban Planning

T M Arifur Rahman*

In recent decades, Bangladesh has been experiencing rapid urbanization, represented by significant changes in its demographic composition and large-scale expansion of its urban landscape. Urbanization caused constant physical change in the urban landscape, resulting in a mix of urban and agricultural land uses. The physical patterns that are created are the result of social, economic and political conditions and processes. As part of this process, agricultural lands both in the central and peripheral areas have been subjected to urban pressures. Rapid urbanization causes disorganized and unplanned growth of the towns and cities. The pressure of an ever growing population becomes the burden on the limited civic amenities which are virtually collapsing; there is the need to balance present requirements of land against future needs.

Prevention of agriculture land in the expanding cities is a vital for preserving and maintaining open space and therefore environmental qualities. Poor land management has resulted in urban areas with inadequate services, infrastructure and corresponding lack of accessibility, that may prove very costly to resolve in future. To prevent urban sprawl and leads to an improper development in any city, it is necessary to monitor the growth of city for sustainable urban development. It is important to understand these trend of urban sprawl as it is one of the potential threats to sustainable development where urban planning with effective resource utilization and allocation of infrastructure initiatives are the key concerns and would help in effective land use planning in urban areas.

In order to improve the country's position in terms of securing access to food, the government of Bangladesh has developed high-level policy initiatives, such as Vision 2021 and Perspective Plan. Such top-down tools and initiatives can only achieve their projected targets if the complex characteristics of the country's diverse deltaic ecosystem are understood thoroughly, while acknowledging the value of ecosystem services.

Many researchers have reported that the environment of Dhaka city has been deteriorating. A number of factors are responsible for such deterioration. Due to high in-migration and rapid uncoordinated urbanization in Dhaka, the environmental and socio-economic degradation have been occurring very rapidly that are alarming for the sustainability of urban landscape and life. Conversion of land use from agriculture to non-agriculture increases the vulnerability of natural disasters and impacts the urban life and environment through ecological degradation, worsening soil and water quality, ground water depletion, creating heat zones, municipal water congestion, food and nutritional insecurity, public health problems, reduction of recreation options, deterioration of mental health, waste management problem and so on.

The development of multifunctional urban green structures can be an important contributor to sustainable urban development in terms of improving the quality of life and environment for current urban populations. The preservation of vegetated areas, or green spaces, and creating and

*Senior Research Fellow, Bangladesh Unnayan Parishad, House-50, Road-8, Block-D,Niketon, Gulshan-1, Dhaka-1212

expanding more green space in and around the cities can improve the quality of life by providing people with natural settings for leisure and recreation, and by safeguarding the quality of precious life-giving resources. Green areas also have the potential for affording citizens the opportunity to get direct economic benefits through urban agriculture.

With scientific advancement, innovative technologies and techniques are being adopted for not only urban spaces, but also in extreme climate zones and other regions where previously farming was difficult or impossible. Efficient planning combined with suitable techniques, both conventional and non-conventional, has helped many countries develop robust urban agriculture. Urban agriculture is an important landscape in many urban areas, especially in many developed and developing countries. In recent days, almost 10 per cent of Greater London's area is farmland with around 30 thousand active allotment holders and nearly 1,000 beekeepers. Some 650 thousand people visit these farms and community gardens every year. In Cuba, over 300 thousand urban farms and gardens produce about 50 per cent of the island state's fresh produce, along with 39 thousand tons of meat and 216 million eggs. On average, a Cuban urban farmer yields 20 kg farm produce per square meter per year. Singapore, the land-scarce city-state, is now experimenting with vertical agriculture to feed its residents. City authorities in countries like India grant tax exemptions for city residents for planting trees on house compounds and good roof gardening.

For the greater public, the ecological functions and environmental benefits of urban agriculture often outweigh the production functions. By producing food locally and balancing production with consumption, the embodied energy of the food required to feed the cities is reduced because of lower transportation distance, less packaging and processing, and greater efficiency in the production inputs. The reduced energy requirements could in turn decrease greenhouse gas emissions and global warming impacts, considered as the major fact for climate change worldwide, compared with conventional food systems. Energy is also conserved by reusing urban waste products locally, both biodegradable wastes for compost, and waste-water (e.g., storm water and grey water) for irrigation. The reuse of wastes offers another benefit in reducing transportation and land use requirements for disposal and long-term management, essentially closing the loop in the cycle of waste management. Urban agriculture, like urban gardens and parks, can also contribute to biodiversity

conservation, particularly when native species are integrated into the system. These systems can offer additional ecological benefits in modifying the urban micro-climate and biodiversity by regulating humidity, reducing temperature and providing shelter for different local species. Furthermore, it can reduce food miles (the distance that food must be transported) and even provide bio-energy resources (e.g., from managed forests).

Urban agricultural (UA) systems appear in many forms–from community farms and roof top gardens to edible landscaping and urban orchards–and can be productive features of cities and provide important environmental services. To achieve sustainable urban development, cities must be planned and managed to form a balance between human being, economy and natural environment by using resources carefully and transferring them to the next generations. Urban agriculture can be one mechanism through which we can contribute to this aspiration.

For Bangladesh, urban agriculture is a relatively recent phenomenon as urbanization gained pace not before the 1990s. Space for urban farming here combines roofs and land, former being the salient feature. According to the website of the government's agricultural information service, Dhaka city has around 450 thousand roofs covering over 4,500 hectares, which is equivalent or even larger than the area of an upazila (sub-district). The utilization of this can bring the simply remarkable result in urban farming. Although interest in roof gardening has increased in recent days and many city farmers have been passionately engaged for over two decades, it is far from fulfilling the potential that city farming offers in the capital.

The Ministry of Agriculture in recent years has set up a separate unit to boost urban farming under which agriculture officers have been appointed, while development organizations such as BRAC, ICCCAD, CDKN and some other organizations have been operating separate programmes combining food security and environmental perspectives. Apart from giving regular advisory services, these organizations are providing seeds and seedlings of vegetables of different varieties since 2019. Beside these, saplings of different tree species have also been distributed among low-income urban households.

With the ever-increasing pace of urbanization, efficient use of urban spaces for food and plant production becomes imperative to achieve the SDG goals related to zero hunger, poverty reduction, health, education and skills development and environment. In this regard, policymakers and experts need to essentially focus on broadening the scopes for urban agriculture in Bangladesh, particularly with the continuous expansion of urban areas.

The ongoing pandemic of COVID-19 has once again reminded us about the preeminence of food security, as reflected in the call of our honorable prime minister to utilize every bit of spare space and corner for food production. To fulfill her call both for immediate and long-term food security, scope for urban farming have to be utilized through methodical planning and its right execution. Intensive research on different aspects of urban agriculture is very much essential to understand the trend and suitability in the context of Bangladesh. Integration of different stakeholders including policymakers, academics, researchers, civil society actors, politicians and media with their expertise and experience, participation, innovation and advance education will help to achieve the targeted goal of adopting urban agriculture in land use policy as a key component.

Sustainable Transportation

Kazi Nazmul Mahmud*

"Air pollution impedes development in Bangladesh. It is estimated that if particulate pollution levels in the four largest cities in Bangladesh were reduced to the standards in force in developed countries, as many as 15,000 deaths, 6.5 million cases of sickness requiring medical treatment, and 850 million minor illnesses could be avoided annually. The economic cost of this avoided sickness and death is estimated to be US$200- 800 million per year," says Jitendra Shah, a Senior Environmental Engineer in the World Bank's South Asia Environment Unit.

The above mentioned paragraph is good enough to realize the importance or the urgency of sustainable transportation in Bangladesh! Moreover to clarify, we know a very well accepted definition of the Sustainable Development all over the world is "Sustainable development is development that meets the needs of the present, without compromising the ability of future generations to meet their own need."

Sustainability Means:

"Sustainability is the balance between the environment, equity and economy"- University of California, Los Angeles. Sustainability presumes that resources are finite, and should be used judiciously and wisely. It serves long-term priorities and consequences. There are basically major three pillars of Sustainability(mcgill.ca/sustainability/files/sustainability/what-is-sustainability.pdf):

- Environment
- Economy
- Society

Sustainable Transport:

"Sustainable transportation refers to low- and zero-emission, energy-efficient, affordable modes of transport, including electric and alternative-fuel vehicles, as well as domestic fuels"-(collected). Sustainable transportation includes walking, cycling, transit, carpooling, car sharing, and green vehicles and these transportations ensure low impact on environment eventually. Here three zero concept can accelerate the transportation system, they are-

- Zero Emission
- Zero Congestion
- Zero Accident

Advantage of Sustainable Transportation:

Sustainable transportation ensures a number of advantages or opportunities and above all the most prominent feature of sustainable transport is environment friendly. Besides-

- Eco-friendly causing less pollution;
- Cost savings on fuel and vehicles;
- Reduced carbon emissions from burning fossil fuels;
- Reduced dependence on non-renewable energy sources;

*Assistant Director, Department of Environment, Headquarter, Dhaka

- Enhanced energy security and independence with less reliance on foreign sources of materials and fuels;
- Reduced traffic congestion.

Current pollution due to transport:

Sometimes development in all sector have been less focused just due to pollution and that might beair, water or soil pollution. And here the transport has intense impact on environment directly or indirectly.

- Unfit vehicles are responsible for 15% of the air pollution in Dhaka- (Source: The Dhaka Tribune, 24th September, 2021)
- Industry operators say nearly 80 percent of batteries are recycled illegally, posing a threat to the environment. Currently, there are just five firms that are authorized to recycle batteries. But there are more than 1,000 firms engaged in the practice in an unauthorized manner. (Source: The Daily Star, 05th March, 2021)

Sustainability in Mindset:

The Prime Minister of Netherlands had frequently been covered in the international news because of his usages of bicycle on the way to his office. A few months' back two judges of our court used their cycle to enter into their office premises. This is all about the mindset, a sustainable mindset that can read the essence of environment. Our Government is marching towards green environment everywhere and as a part of that Cycling is encouraged mostly. Recently, North City Corporation, Dhaka has developed another lane for safe cycling in Agargaon. Apart from that four banks and a financial institution has teamed up to finance tk 314 crore primarily to set up an electric vehicle manufacturing plant in Mirsarai, Chattogram in order to promote environment friendly sustainable transport industry. Here is this case, our Honorable State Minister of Power, Energy and Mineral Resources Mr. Nasrul Hamid has said, "Electric Vehicles are environment friendly ones and the mechanical efficiency of electric vehicles is much higher than that of petrol run vehicles"-

Epilogue:

"Think globally, Act locally"- this well renowned theme spread the message of miniature issues in local sector which might have impact on large scale. If we cannot ensure a healthy environment for future generation, then all other development efforts will go in vain! That's why, now the world community focuses on sustainability as well as our government is very committed to ensure sustainable development not only in transport sector but also in all other sectors.

The Implications of Having `Only On Earth'

Tayeba Tahsin Nawar*
Raisa Binte Huda*

Mankind has known since time immemorial that there is only one earth. A simple but absolute truth. Yet such is the ironic destiny of man that he is cognitively predestined to not grasp the immensity of this statement even though he knows of it.

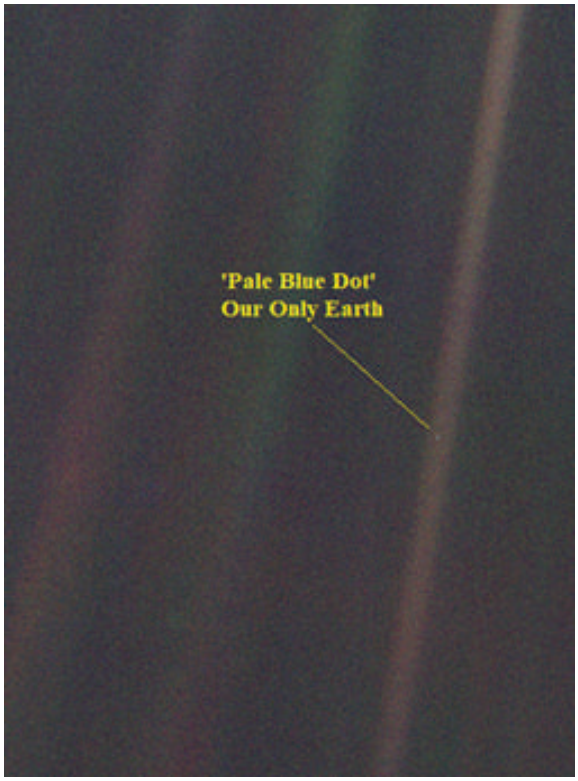

Image 1, Earth appears as a tiny speck, later dubbed as the 'Pale Blue Dot' by Carl Sagan, in this 'portrait' of the Solar System taken by Voyager 1.

We do know that there is only one earth. But what does it really mean for the individual?
First is a straight-forward numerical implication: There is only one earth and not a single more. This means that 'this is it'. There is no replacement for it. The aggregate of our existence, of our joys and woes, all exist here and only here. The house that you dream of, embedded in the lap of nature, hidden away by the shade of a lone tall tree; the house for which you work every day, and for which you brave through the dregs of life, exists in a future only on here. On this one Earth. The cheaply made and monstrously wasteful fast-fashion industries you buy from, for events with friends you hope will be there forever, conveniently gloss over the fact that this 'forever' can only exist on here, on this only one Earth. The past, the present and the future, all exist only on here.

The implication, then, is that we are constantly struggling and planning for a future through means that are actively destroying it.

Perhaps this is because it is inconceivable to our imaginations that the infinity of the seas, the omnipresence of the air and the vast existence of the Earth could be as much as even gently inconvenienced by our actions. Thus, we carry on, completely certain in the belief that the destruction of the world is another's headache, in the distant future and not a concern for our daily lives.

Yet as T.S. Eliot has beautifully surmised, the world will 'not end with a bang, but with a whimper': Before the absolute void comes the slow and gradual death. The world might completely end eons into the future, but our own daughters and sisters and perhaps even ourselves will miscarry before it, due to increased exposure to Particulate Matter. Similarly, before the end will come incessant noise, from trucks and trawlers, with just enough relief to prevent insanity. Before complete annihilation will come silent springs and premature deaths of loved ones. Before the end will come food that bear more poisons than nutrients.

**General member of Environmental Club, Department of Geography and Environment,University of Dhaka*

Image 2, False Mirror by René Magritte: As we look into the eye, it looks back; similarly, as we threaten the Earth's existence, it will answer back.

There might be over a few thousand planets in the universe that can support life, but till now, we are yet to find anything like our Earth. Yes. There is nothing like it. Most of us grew up reading science fictions where people had to leave Earth and migrate to other planets in the galaxy to settle down due to a catastrophe, or, most commonly, irreparable pollution. But at present, this state of pollution that's almost beyond repair is not fiction anymore. As much as we want to stay in denial, our only one Earth is at its limit.

Human is the most evolved living being on Earth, and they obviously consider themselves as the smartest. But are they truly the smartest? Earth's most developed nations like China, United States, Russia and Japan are the world leaders in air pollution emissions. About 400 million metric tons of hazardous wastes are generated every year. (Microsoft Encarta Online Encyclopedia, 2009). The USA alone produces about 250 million metric tons. Americans constitute less than 5% of the world's population, but produce roughly 25% of the world's Carbon Dioxide, and generate approximately 30% of world's waste. In 2007, China overtook the United States as the world's biggest producer of CO_2, while still far behind based on per capita pollution (ranked 78th among the world's nations). (CDIAC, 2008).

Even children have an idea about the global environment situation and they know it's not quite well. But are we able to actually comprehend how dire this situation is? Research evidence shows that the future conditions will be far more dangerous than we believe right now. The extent of the threats to the biosphere and all its lifeforms, including humanity, is in fact so great that it is difficult to grasp for even well-informed experts. (Bradshaw et al., 2021) Despite the global attention towards pollution, the impact is still being felt due to its severe long-term consequences.

Humanity is causing a rapid loss of biodiversity and, with it, Earth's ability to support complex life. But the mainstream is having difficulty grasping the magnitude of this loss, despite the steady erosion of the fabric of human civilization. (Ceballos et al., 2015; IPBES, 2019; Convention on Biological Diversity, 2020; WWF, 2020). Despite being the most developed creatures, human beings know no limit in case of consumption, exploitation or population boom – which are the sole reasons of environment pollution, degradation of biosphere and destruction our Earth itself. Over the last few decades, this situation has been continuously going up exponentially and clearly, these actions have been not in favor of protecting this planet. As a result, we are facing natural disasters rapturing our lives more often in the form of floods, drought, blizzards, tsunamis, cyclones and sometimes

even as earthquakes. This has resulted in a widespread, ongoing mass extinction of other species during the present geological epoch, now known as the Holocene extinction. The large-scale loss of species caused by human influence since the 1950s has been called a biotic crisis, with an estimated 10% of the total species lost as of 2007. (Norman, 2000) At current rates, about 30% of species are at risk of extinction in the next hundred years. (Novacek, 2001).

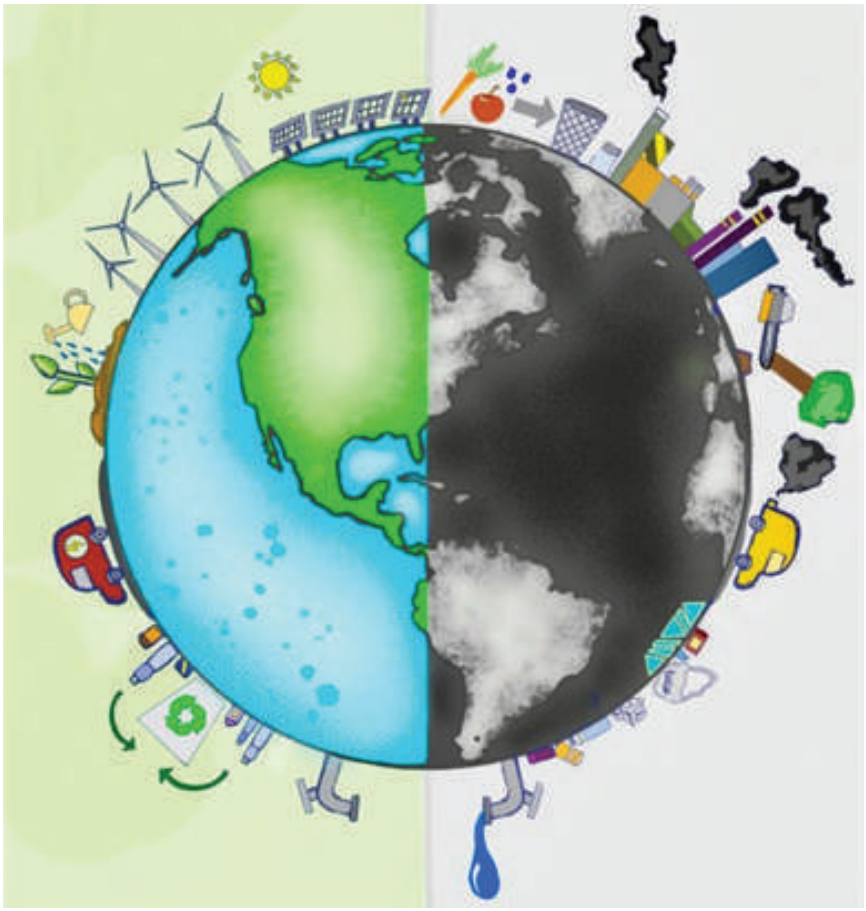

Ground water depletion, sea level rise, global warming – these problems are explicitly hampering people's lives every passing day and are destroying all sorts of natural habitats causing many species to go extinct. These global problems are increasing in both number and magnitude due to environment pollution and degradation caused by none other than us, the smartest and maybe, the ungrateful humankind, as we keep harassing our mother Earth, forgetting that we reside on her. As Barry Commoner said, "Environmental pollution is an incurable disease. It can only be prevented."

As we keep releasing synthetic, toxic chemicals into the environment, these in turn are affecting our water, land and air. Man's activities through urbanization, industrialization, mining, and exploration are at the forefront of global environmental pollution. (Ukaogo, 2020). Industries have been polluting our environment, especially since the beginning of the industrial revolution, due to the increased use of fossil fuels. Though pollution by industries mainly causes air pollution, it can also contaminate soil and water. Like industries, pollution caused by transportation and vehicles can mainly be attributed to fossil fuels. Increased use of chemical pesticides, and the intensive character of modern agriculture is mainly responsible for the contamination of water and soil. Agriculture is getting more intensive day by day to feed the increasing world population. So more natural

environments, forests and ecosystems are destroyed to make space for the food crops. To provide shelter for ever-growing population, we build homes by destroying and clearing out the natural environment in one way or another. Wildlife and plants are driven away and replaced by human constructions. As it requires the work of industries, construction itself is also a source of contamination of the environment.

The effects of pollution on humans are mainly physical, and in some cases cause neuro-affections in the long term. Respiratory distress like allergies, asthma, irritation of the eyes and nasal passages, or other forms of respiratory infections, heat strokes, rash, skin problems and even cancer is prevailing more now due to natural degradation and pollution of the environment.

Environmental pollution affects animals by impairing their living environment or habitats by making it toxic for them to live in. Acid rains or global warming can change the composition and temperature of waterbodies, making them virulent and unhabitable for aquatic animals. Soil pollution causes harm and destruction of many useful microorganisms, which can have the dramatic effect of killing the first layers of our primary food chain. We can undeniably conclude that human actions have directly or indirectly, a negative effect on the ecosystem, destroying crucial layers of it and causing an even more negative effect on the upper layers as well.

As Evo Morales said, “Sooner or later, we will have to recognize that the Earth has rights, too, to live without pollution. What mankind must know is that human beings cannot live without Mother Earth, but the planet can live without humans.”

So, it is mandatory upon us to find out solutions and put them on work to manage our environment and halt destroying our only Earth. Environmental planning should be considered as the foundation for all projects done on Earth’s surface. And we should soon shift from traditional fossil fuel-based energy consumption to renewable energy sources. Eco-friendly manners and lessons are to taught since early ages among children so they can grow up to be better human beings who would care for the Earth more than their predecessors. “One way to open your eyes is to ask yourself, "What if I had never seen this before? What if I knew I would never see it again?” (Rachel Carson).

Let us take out a few moments out from our life and ponder over what our mother Earth has given us, and what we have given her in return. If each of us starts to take the smallest steps towards saving our planet, it would turn into a tide and sweep up the whole Earth.

When we would need some encouragement along the way, we can go over Rachel Carson’s words - “Those who contemplate the beauty of the earth find reserves of strength that will endure as long as life lasts. There is something infinitely healing in the repeated refrains of nature -- the assurance that dawn comes after night, and spring after winter.”

কবিতা

একটাই জীবন একটাই পৃথিবী

মনিরুজ্জামান বাদল*

অগণিত বালুকণার তপ্ত হৃদয়
গলে গলে সিক্ত হয়, জলের আদরে
গড়ে উঠে অখণ্ড চরের বিস্তীর্ণ ভূমি,
সাগর নদীর উত্তাল ঢেউয়ের বিপরীতে
একমুঠো জীবন,
স্রোতে ভাসে পিঁপড়ার দল।
সবটুককু বিশ্বাস কেবল জলের বুক,
বাতাসের তালে তালে
রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার প্রহর গুণে ।
কখন, থেমে যাবে মহামারির দুর্যোগঝড়?

বানের জল ধুইয়ে দেয় সমস্ত পাপ
পলির স্তরে থিতু হয়
জীবনের দল।
সূর্যকিরণ থেকে সঞ্চয় করে শক্তি
ভরাজোছনার স্নিগ্ধতা যোগায় ভালোবাসা।
চরের জমি পোয়াতি হয়,
কিষাণের লাঙ্গলের আঘাতে
ওঠে আসে পোমের গন্ধ,
ধারণ করে জীবনের বীজ।
ধান-গম, তিল-তিসি,
সরিষা-কলাই-ঘাস,
কাউন-খেরাচির চিকচিক হাসি
সবুজ ঢলফলা জীবন ।
ভুরভুর গন্ধে সম্মোহিত সকল
দোয়েল-শালিক-বক,
হরিণ-সিংহ-খরগোশ,
দুধেল গাই, ষাড়ের বাঁকানো শিং,
ঘোড়ার বাহারি কেশর!

একটাই জীবন একটাই পৃথিবী
গায়ে গায়ে মাখামাখি,
অন্তরে ঢুকে যায় অন্তরের সুর
সকলের সম্মিলিত জীবন,
পৃথিবীর সমৃদ্ধ যৌবনসুখ।

*অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

"একটাই পৃথিবী: প্রকৃতির ঐক্যতানে টেকসই জীবন"

সুকুমার বিশ্বাস*

অপরূপ সুন্দর মনোরম পৃথিবী
জীবনধারার বিশ্বস্ত আবাস ভুমি।

নির্মল বায়ু দূষণমুক্ত বিশুদ্ধ জল
জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে আছে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান।

সুরক্ষার একান্তই দাবী এ সময়ে–

যতনে রাখতে হবে পৃথিবীর সমস্ত উপকরণ
যতনে রাখতে হবে প্রকৃতির স্বাভাবিক সকল চক্রায়ন।

নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, সাগর-মহাসাগর
মাঠ-ঘাট অবারিত প্রান্তর চলমান অবিচল নিয়মে।

আমাদের সকলের আজ আবেদন–
পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীবনের বৈচিত্র্যের সুরক্ষার।

*প্রক্তন পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

পার্বত্য প্লাবন

ভদ্র সেন চাকমা*

পর্বত দেবতা,
জানি, তোমার বুকের পাথর পর্বততুল্য ভারী!
চৈত্রের প্রখর তাপে তুমি অগ্নীল বিদ্রোহী।
বর্ষাবাণে দিগন্ত জলধি।

"প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও বন্যাপ্রবণতার স্বীকৃতি"
তোমার জন্য অন্যায্য।
কেউ দেখে না ঝরছে প্রাণ,
খানিক বর্ষণে চৌদিকেই বাণ।
বঞ্চনা কি কেবল তোমার প্রাপ্য?

লক্ষ শিশুর আগাম ক্রন্দনধ্বনি।
ঠাঁই নাহি আর সাঙ্গু, চেঙ্গী, মাইনী, ফেণি, মাতামুহুরী,
জনভারে ন্যুজ পাহাড় কাচালং, কর্ণফুলী ভ্যালি।

পাহাড় দেবতা এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়;
ধুসর ঝিরি-ঝর্ণা, উপত্যকা, সমভূমি-
বৃক্ষনিধন, পাহাড়ছেদন
বিরান পর্বত ভূমি।
ভূমিক্ষয়, বসতসৃজন, নদী-নালা, খাল-বিল,
কৃষিজমি ভরাট,
অসময়ে বরষণ, উষ্ণতা বিশাল,
অশুভ দানবীয় প্রভাব,
স্রষ্টার সৃষ্টি; সবুজাভ পর্বত বিক্ষত আজ।

নির্বাক পাহাড়, অন্তরে দহন, জ্বলছে বসুমতি।
উন্মুক্ত মাঠ, বসতভিটা, শস্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমি।
পাহাড়ধ্বস, বিধ্বস্ত জনপদ, বসতি, গবাদি।
ঝরছে অশ্রু, বিদীর্ণ আর্তনাদ অফুরান নিরবধি।

*প্রধান শিক্ষক, কাচালং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

সবুজ ছায়ায় সবুজ মায়া

গুরুদেব কুমার সরকার*

সবুজ শ্যামল বৃক্ষ সুনিবিড়, স্নিগ্ধ শীতল বায়ু
বুকভরে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
চির যৌবনা, প্রাণবন্ত প্রকৃতিতে।

পাতার ফাঁকে সঞ্চিত সুশীতল বাস্প, প্রশান্তির হাত বুলায়-
ক্লান্ত পথিকের মাথায়,
স্বস্তির নিঃশ্বাসে ফিরে আসে কর্মস্পৃহা
ক্লান্তিময় নগরীর ব্যস্ততম মানুষের প্রাণে।
কখনও বা পাখির কিচিরমিচির শব্দে,
উল্লসিত প্রকৃতি প্রাণ ফিরে পায় সবুজ শ্যামলীমায়,
বসন্তের কোকিলের স্বরে দুষ্ট ছেলে সুর মেলায়- কুহু কুহু কুহু

সবুজ পাতায় নুপুরের সুরধ্বনি বাতাসে ভাসে
সবুজের মায়ায় জড়িয়ে ললনার খোঁপার ফুল ভালোবাসে বৃক্ষরাজি শোভিত সড়ক দ্বীপ,
নাচুনী কাঠবিড়ালী তালে তালে পায়ে লয় মিলায় গাছের ডালে
গাছে গাছে আলিঙ্গন, সৌন্ধর্য পিয়াসি মানুষ লালায়িত হয় অপরূপ শোভায়
মনলোভা আকর্ষণে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সবুজের মায়ায় জড়িয়ে পড়ে আত্মভোলা কবি।
বকুল-হাসনাহেনার গন্ধে মাতোয়ারা এ ধরণী মোহিত হয় নিসর্গের মায়ায়।

ম্যুরাল চিত্র, ভাস্কর্য অথবা কোনো ফোয়ারার পাশে, শোভিত বৃক্ষ সারি
সুটিং স্পটে বাড়িয়ে দেয় সুপারহিট নায়িকার রূপের ঝলকানি,
ক্যামেরাবন্দি হয়, ঢাকা মহানগরের রমনীয় সৌন্দর্য।
এমনি চিরসবুজের মায়ায় জড়িয়ে আত্মভোলা পর্যটকের ডাইরিতে লিপিবদ্ধ হয়–
সবুজ বাংলার সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপকথা।

ইট-পাথরের স্বপ্নের এ নগরীতে, স্বপ্ন বেঁচে থাকে–
সবুজ ছায়ায় সবুজ মায়া।

*পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন গ্রুপে শ্রেষ্ঠ মাশহুন জাহান মুগ্ধ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
গ গ্রুপে শ্রেষ্ঠ অর্নিলা ভৌমিক

পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
খ গ্রুপে শ্রেষ্ঠ প্রত্যয় পাল রাজ

বিশেষ পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
ক গ্রুপে শ্রেষ্ঠ সুহাইব ওয়াসিত্ব

পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোনঃ +৮৮-০২-৮১৮১৮০০, ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭৭২
ইমেইলঃ dg@doe.gov.bd ওয়েবসাইটঃ www.doe.gov.bd